ইসলাম প্রচারে মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা

(বাংলা)

الطب النفسي والدعوة إلى الله

(اللغة البنغالية)

تأليف : عبد الله الخاطر – رحمه الله –

লেখক: আব্দুল্লাহ আল-খাতির রহ.

ترجمة : عبد الله الشهيد عبد الرحمن

অনুবাদ: আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুররহমান

ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

1429 – 2008

islamhouse.com

বিষয়সূচী

বিষয়

১. ভূমিকা
২. ইসলামের দাওয়াতে মনোবিজ্ঞান
৩. মনোবিজ্ঞান কি?
৪. মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি
৫. আলোচনার পদ্ধতি ও সত্যবাদিতা
৬. মানুষের মধ্যে আপনি কিভাবে প্রভাব বিস্তার করবেন?
৭. মানুষকে তার বুদ্ধি অনুযায়ী সম্বোধন করা
৮. চিন্তা-ভাবনার ভুলপদ্ধতি কিভাবে সংশোধন করবেন?
৯. অনুকুল পরিবেশ তৈরী করা
১০. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মধ্যেই রয়েছে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ
১১. ব্যক্তিত্বের নিরুপন
১২. উত্তম চরিত্র ও সৎস্বভাবের মূল্যায়ন করার গুরুত্ব
১৩. দাওয়াতের ক্ষেত্রে কোন সামাজিক চিকিৎসা আছে কি?

এই বইতে যা যা পাবেন :

➡ মানুষের সৃষ্ট জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে ইসলামের স্বার্থে ব্যবহার করার পদ্ধতি ।

➡ প্রত্যেক মানুষের বাস্তব বিত্তিক ও সুচিন্তিত গভেষণাকে ইসলামের সেবায় ব্যবহার করার কৌশল ।

➡ মানববিজ্ঞান, বিশেষ করে মনোবিজ্ঞানকে সত্য ও সঠিক পথের নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করার নিয়ম ।

➡ মানববিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানকে ইসলামের শাশ্বত বিধান এবং আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আদর্শের আদলে রুপান্তর-গঠন ও প্রয়োগ করার প্রজ্ঞা ও হিকমত ।

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার জন্য অবশ্যই। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁর নিকট-ই সাহায্য চাই। আমরা মনের কুমন্ত্রনা ও মন্দ আমল থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ্ চাই। আল্লাহ তা’আলা যাকে হেদায়েত দান করেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। পক্ষান্তরে যাকে তিনি বিপথগামী করেন তাকে কেউ হেদায়েত দিতে পারে না। আল্লাহর নিকট কামনা করি এমন ঈমান, যার পশ্চাতে কুফরী নেই; সত্যের উপর এমন দৃঢ়তা, যার পাছে বিচ্যুতি নেই; আরো কামনা করি উপকারী সে ইলম, যার পর মুর্খতা নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা’বুদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসুল। আল্লাহ তা’আলা তাঁর উপর, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীদের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।

এটি একটি ক্ষুদ্র রচনা। এর আলোচ্য বিষয় ‘মনোবিজ্ঞানকে ইসলামের দাওয়াতে ব্যবহার করার পদ্ধতি।’ আল্লাহ তা’আলার নিকট কামনা করি, তিনি যেন এর আলোচ্য বিষয় দ্বারা বিপুল সংখ্যক জ্ঞানপিপাসুদের তৃষ্ণা মেটান। আল্লাহর অনুগ্রহে আমরা সত্য ও তাওহীদের বাণী সমুন্বত করার সু-মহান প্রচেষ্টায় নিয়োজিত।

এ পুস্তকে আরো আলোকপাত করা হবে পাশ্চাত্য দেশসমুহ থেকে আহরিত মানববিজ্ঞান সম্পর্কে। যেমন : মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সংগঠন বিজ্ঞান ও যোগাযোগ বিদ্যা প্রভৃতি। এ ধরনের বিষয়ের মধ্য থেকে আমাদের উপকারের স্বার্থে পরিত্যাজ্য ও গ্রাজ্যের

পরিমানও বিবেচনা করা হবে। সাথে সাথে এগুলো গ্রহণের উদ্দেশ্য এবং এর লাভ ক্ষতির হিসেবও কষা হবে।

আমরা লক্ষ্য করছি, মুসলিম যুবসম্প্রদায় পাশ্চাত্য শিক্ষার আদ্যপান্ত আত্মস্থ করত পাঠক মহলকে সন্দিহান বিষয়-বস্তু থেকে পরিচ্ছন্ন রাখতে সক্ষম হচ্ছে। তবে কেন আমরা এ শিক্ষা-দীক্ষার উপকারী-উপাদেয় ও ইতিবাচক বিষয়গুলো এবং অভিজ্ঞতা প্রসূত তথ্যাদি ইসলামের স্বার্থে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকব!?

ইসলামের দাওয়াতে মানববিজ্ঞান

পাশ্চাত্যের দেশসমুহ থেকে আহরিত মানব বিজ্ঞানের (মনোবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, সংগঠন বিজ্ঞান ও যোগাযোগ বিদ্যা ইত্যাদি) দিক থেকে মুসলিম বিশ্বের মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত :

প্রথমত : যারা বিশ্বাস করে কোন অবস্থাতেই পাশ্চাত্য বিদ্যা গ্রহণ করা যাবে না। কারন সেটা একটি ত্রুটিপূর্ণ ভিত্তিমুল থেকে উৎসারিত ; সুতরাং এর অবশ্যম্ভাবী ফলাফলও ত্রুটিপূর্ণ হবে। এটা হল সাধারন মানুষদের অধিকাংশের মতামত।

দ্বিতীয়ত : যারা সকল বিদ্যা আহরন করার প্রবক্তা ; চাই সেটা ভাল হোক কিংবা মন্দ, ইতিবাচক হোক কিংবা নৈতিবাচক।

তৃতীয়তঃ যারা বলে সর্বপ্রথম এই বিদ্যাকে পরিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন করতে হবে। অতঃপর আমরা তা হতে যা ইতিবাচক তাই গ্রহণ করবো, আর যা নৈতিবাচক তা পরিহার করে চলবো। অর্থ্যাৎ আমরা শুধুমাত্র সেই বিষয়গুলো গ্রহণ করবো যা অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার অনুকুল। পক্ষান্তরে এমন দৃষ্টিভঙ্গি, দর্শন ও গবেষণা অবশ্যই পরিহার করে চলতে হবে যা কোন সুস্থ মুলনীতির উপর গড়ে উঠেনি।

উল্লেখিত তৃতীয় শ্রেণীই হচ্ছে আমাদের প্রতিপাদ্য ও লক্ষ্য। অতএব আমরা এখন ঐ সকল জ্ঞান-বিদ্যা জেনে নেব যা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে উত্তীর্ণ নয়। একজন মুসলিম যুবকের কাছ থেকে কাম্য হচ্ছে- যা কিছু গ্রহণ করছে, সে তা পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করে নেবে। এবং আহরিত জ্ঞান ও অর্জিত বিদ্যা সে এই দীন-ইসলামের সেবায় নিয়োজিত করবে। তা উক্ত পদ্ধতিতে হোক অথবা তার নির্দেশিত লক্ষ্যেই হোক, তাতে কী আসে যায়।

মনোবিজ্ঞান হচ্ছে, আমাদের যুব সমাজ পাশ্চাত্যের দেশসমুহ থেকে যে বিদ্যা আহরণ করে তার অন্যতম। কিন্তু একটি বিদ্যা হিসেবে মনোবিজ্ঞান মনোরীতির উপর কেন্দ্রিভূত। সঠিক রোগনির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান নির্ভর করে, রোগী ও চিকিৎসকের সরাসরি বৈঠক ও সাক্ষাতের উপর ।

এ পর্যায় আমাদের অবশ্যই জেনে রাখতে হবে যে, মনোবিজ্ঞান ও আত্মবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য আছে :

মনোবিজ্ঞান হল : যা সকল উত্তম বৈশিষ্ট্য শিক্ষা দেয়। কারন, দৈহিক ও আত্মিক রোগসমুহ একটা অন্যটার অন্তর্ভূক্ত, একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। সে কারনে কখনো বা দৈহিক রোগের কারণে মন রোগাক্রান্ত হয়ে যায়। আবার মনের কারণে দেহ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং একজন পাঠকের কর্তব্য হচ্ছে- সকল দৈহিক রোগের কারন, উপসর্গ ও পরিণতি জেনে নেয়া।

দ্বিতীয়টা হচ্ছে আত্মবিজ্ঞান : এটা শিষ্টাচার সম্বলিত বৈশিষ্টাবলী। মানব আচরন, তার দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যবহারের পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং-এ সবগুলোর প্রতি গুরুত্ব দেয়। তবে উক্ত বিজ্ঞানসমুহের মধ্যে অসংখ্য অতিরঞ্জি বিষয় থাকে, যা থেকে উক্ত জ্ঞানকে

পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করা ও সঠিক পথে দিকনির্দেশনা দেয়া প্রয়োজন। হে আল্লাহ ! এ মহান প্রয়াস অধুনা বিশ্বের অনেকেই আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন আলেম রয়েছেন, যারা এ চিন্তাটা করেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের পথের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও গবেষণা পদ্ধতির পর্যাপ্ত উৎকর্ষ সাধন একান্ত প্রয়োজন। এবং বিশুদ্ধ ইসলামী গবেষণার জন্য তাদের মনোবিজ্ঞান আয়ত্ব করা কর্তব্য।

মনোবিজ্ঞান কি?

মনোবিজ্ঞান হচ্ছে, আমাদের পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীদের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের সার-নির্যাসের অপর নাম। যারা আমাদেরকে সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা উপহার দিয়েছেন, অভিজ্ঞতার ফলাফল লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন; যাতে করে উত্তরসুরীরা এ সকল বিষয় থেকে উপকৃত হতে পারে। আর এমনিভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন অব্যাহত ছিল। এবং প্রত্যেকেই অর্জিত অভিজ্ঞতা ও তাদের গবেষণা ও অভিজ্ঞতার নির্যাস লিখে রাখতেন। তাদের নিজেদের ও অন্যদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে অবহিত করে দিতেন। উক্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি, অভিজ্ঞতা ও তার পুর্নাঙ্গ ফলাফল বিজ্ঞানগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। যাতে মনোবিজ্ঞানীরা সেখান থেকে উপকৃত হতে পারেন।

সম্প্রতিকালে অধিকাংশ মানুষের মধ্যে লিঙ্গ সংশ্লিষ্ট সমস্যায় সৃষ্ট সন্দেহ নিরসনের জন্য তারা গভীর ভাবে পাঠ দিচ্ছেন। বরং এখনোও অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানিরা 'ফ্রয়েড' এর দর্শনে অতৃপ্ত ও অসন্তুষ্ট; কারণ তিনি তার দর্শনে অধিকাংশ সমস্যার কারণ নির্ণয় করেছেন লিঙ্গের মাঝে যোগসুত্রকে। যেহেতু 'ফ্রয়েড' শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় রোগীর উপর কয়েকটি পরীক্ষা চালিয়েই এ দর্শন চয়ন

করে, অতঃপর সে তার ধারণাকে সকল মানুষের জন্য প্রচলন করতে শুরু করে। তাই তার দর্শন সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য নয়

মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি

মনোবিজ্ঞানে আমাদের নিকট যে বিষয়টা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে- একজন মনোবিজ্ঞানী তথ্যাদি সংগ্রহ সংরক্ষণে, মানুষের আস্থা অর্জন ও তাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তারে যে পদ্ধতিটা অবলম্বন করে থাকেন। তাদের ব্যক্তিত্বের পরিচিতি, মন্দ আচরন পরিবর্তন পদ্ধতি ও তাদের ভাল আচরণের প্রশংসা; এটাই হচ্ছে এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়। সুতরাং এখানে আলোচনা হবে শুধুমাত্র ঐ পদ্ধতি সম্পর্কে যা একজন মনোবিজ্ঞানী প্রয়োগ করে থাকেন। তবে আত্মিক রোগ সমুহ ইত্যাদি ...... বিষয় এখানে আলোচনা হবে না। এমনিভাবে ইসলামের দাওয়াতের ক্ষেত্রে আমরা মানুষের সঙ্গে আচর-আচরণ, লেনদেন ও কথা-বার্তায় সর্বোত্তম পদ্ধতি গ্রহণের ব্যপারে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আদিষ্ট।

আল্লাহ তাআ'লা এরশাদ করেন-

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ.

“তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান করো হিকমত ও সদুপোদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা করো উত্তম পদ্ধতিতে।”[১]

---

[১] সূরা আন নাহল : ১২৫

কাংক্ষিত জ্ঞান, উত্তম উপদেশ ও উৎকৃষ্ট পদ্ধতি ইসলামের দাওয়াতের প্রত্যেকটি ক্ষেত্র উন্মুক্ত ; যতক্ষণ পর্যন্ত তা শরীয়তের মুলনীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হয়। সুতরাং দাওয়াত-কর্মীগন আমলের উৎকর্ষ সাধনে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি, মাধ্যম ও প্রকাশ পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারবে। মনোবিজ্ঞান এমনি একটা উত্তম পদ্ধতি; যদি তা শরিয়তের কোন বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। তখন আমরা যে কোন সু-দৃঢ় ও স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারবো-যা ইসলামের দাওয়াতের ক্ষেত্রে আমরা প্রয়োগ করতে পারি। দাওয়াতের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র শিক্ষা নয় ; বরং আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে-পরিচর্যা, শিক্ষা এবং আচার-ব্যবহারকে উত্তম রূপ দেয়া। ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বকে আল্লাহর সঠিক পথে ও ইসলামের সু-শীতল ছায়াতলে সুন্দর ও সঠিকভাবে লালন করা ও বিকাশ ঘটানো। আর এটাই হচ্ছে দাওয়াতের প্রতিপাদ্য, অভীষ্ট লক্ষ্য। দাওয়াতের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত ব্যক্তিদের নিকট বিষয়টা নতুন ও অপরিচিত মনে হতে পারে। কিন্তু দাওয়াতী কাজে বিশেষ নৈপুণ্য অর্জন করতে এ পদ্ধতি প্রয়োগের বিকল্প নেই। প্রত্যেক বিশেষজ্ঞকে তার অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়ে তার সত্য ধর্মের সেবা করা ইসলামী দাওয়াতের দাবী। অতএব আমরা এই বিশেষ জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তিকে শুধু রুজী ও জীবিকা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে এবং এর মাধ্যমে কোন চাকুরী বা সুযোগ বাগিয়ে নিতে চাই না। বরং তার এ বিশেষ জ্ঞানের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধন, এর ব্যাপক ও সঠিক প্রয়োগ করতে চাই। এ বাপারে সংশ্লিষ্ট কারো দ্বি-মত নেই।

আমি বিপুল সংখ্যক পাঠক ভাইদের কথা বিবেচনা করে- যারা জানতে চায় কিভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে আমরা মানুষের মাঝে

প্রভাব বিস্তার করতে পারবো- এ মৌলিক বিষয়টার উপর খানিকটা আলোকপাত করতে চাই। শুরুতে এটা একটা দুর্বোধ্য বিষয় ছিল। যেমন কিভাবে একজন মনোবিজ্ঞানী মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে এবং কি করে তাদের আস্থা অর্জন করতে পারে। আগে তো মানুষ আশঙ্কা, ভয় ও উৎকণ্ঠার মধ্যে জীবন কাটাতো । মনোবিজ্ঞানীকে এই ভেবে ভয় করতো যে, সে তার ব্যক্তিগত বিষয়গুলো প্রকাশ করে দেবে কারণ তার সকল কর্মকান্ড সে জানে। তখন এই ধারনাটা বর্তমান সময়ের ইন্টারনেট ও স্যাটেলাইটের মত সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। তবে এই সমস্যাটা এতটা সহজ নয় যে, এই ক্ষুদ্রপুস্তিকার মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা দেবো কিংবা কঠিন বিষয়কে সহজ করে দেবো। আমি সে সকল বিষয় অনুসন্ধান করি যা মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি এবং ইসলামের দাওয়াতে তার প্রয়োগের সম্ভাবনা আছে। আমাকে পরিপূর্ণ তৃপ্তি দান করেছে যে বিশ্বাস টা তা হচ্ছে, অবশ্যই দাওয়াত-কর্মীগণ এক মহান বিষয় ও শাশ্বত গবেষণার অধিকারী হয়েছে। কিন্তু যাকে দাওয়াত দেয়া হবে তার মধ্যে প্রভাব বিস্তার, বিষয়বস্তুকেকে গ্রহণযোগ্য ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের জন্য একটি সু-নির্দিষ্ট পদ্ধতি প্রয়োজন । আর এটাতো এমন একটি বিষয় যা অধিকাংশ দাওয়াত-কর্মীর নেহায়েত প্রয়োজন। কখনো বা বিজ্ঞানীদেরও এর প্রয়োজন হয়ে পরে।

আমি আপনাদের জন্য এখানে কয়েকটি উদাহরণ দেবো। নিশ্চয়ই ইসলাম আমাদের জন্য বহুবিধ বিষয় বিধিবদ্ধ করেছেন। আর বিস্ত ারিত বিধানে -যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়েছে- আমাদের আচরন কি হবে? যা তার সু-বিস্তীর্ণ পথসমুহ বাতলে দিয়েছে। যখন আমরা মনোবিজ্ঞানের

জন্য কোন বস্তু বা বিষয় নিয়ে আসবো, তখন এ দ্বারা কোন অনভিপ্রেত বা নবআবিস্কৃত বিষয় কখনোই আমাদের উদ্দেশ্য নয় । উদাহরণত : একজন যুবক এসে যদি বলে- 'এটা একটা নতুন কারণ অথবা নব আবিস্কৃত বিষয় । এ জাতীয় বিষয় কি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবহার করেছেন?' তখন আমরা তাকে উত্তরে বলবো, 'হ্যাঁ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এজাতীয় বিষয় ব্যবহার করেছেন ।' এখানে আমাদের লক্ষ্য করা উচিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের রা. সঙ্গে কিরূপ আচরণ করেছেন । এবং তাঁকেই আমাদের সর্বোচ্চ উদাহরণ ও আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত । উল্লেখ থাকে যে, মনোবিজ্ঞানীদের নিকট মানুষের সঙ্গে ব্যবহার পদ্ধতিতে সু-নির্দিষ্ট ও অতিসুক্ষ কিছু উপায় থাকে । যেমন কিভাবে আমরা তার আস্থা অর্জন করতে পারি এবং কিভাবে একটি মানুষের চেহারার অভিব্যক্তি বুঝতে পারি?

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস ভান্ডারকে তুমি যদি উদাহরন হিসেবে নিতে পারো, তাহলে এই বস্তুর জোগাড় ও মন্দ ব্যাখ্যার তোমার আর প্রয়োজন হবে না ।কিন্তু এটা অবশ্যই বুঝতে হবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অর্থ কিভাবে বুঝেছিলেন এবং এর মর্মই বা কিভাবে উপলব্ধি করেছিলেন । যখন একই প্রশ্নের উত্তরে একাধিক প্রশ্নকারীর ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দিয়েছেন । আর এটা একমাত্র রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সুক্ষ্ম বিচক্ষণতার মাধ্যমে তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ব্যাপারেও অবহিত হতে সক্ষম হয়েছিলেন ।

অতএব বিশেষজ্ঞ দায়ীবৃন্দকে সীরাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধ্যায়ন এবং কিভাবে তিনি মানুষের সঙ্গে ব্যবহার

করেছেন তা জানা কর্তব্য। এর প্রমাণ স্বরূপ কতিপয় বিবাদমান বিষয়ে কোন অভিমতকে বিশ্লেষন করার জন্য শরিয়তের কয়েকটি প্রমাণ শুনিয়ে দেয়া দরকার ; কিভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের আস্থা ও ভালবাসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

উদাহরন স্বরূপ: মনোবিজ্ঞানী রোগীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাত থেকে - যা রোগীর সঙ্গে এক ঘন্টা বা তার অধিক সময় পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল- সে অনেক বিষয় জানতে সক্ষম হবে। অতএব আপনি একজন দায়ী হিসেবে যদি এ পদ্ধতিটা প্রয়োগ করতে পারেন তাহলে নিশ্চয়ই আপনি প্রথম সাক্ষাতেই কাংক্ষিত দাওয়াত দিতে সক্ষম হবেন ; চাই সুস্থ বা অসুস্থ যে অবস্থায়ই সে থুকক না কেন। সর্বোপরি আপনি তার আস্থা ও ভালোবাসা অর্জন করতেও সক্ষম হবেন । এ অবস্থায় আপনার প্রভাব তার উপর দ্রুত ও গভীরভাবে পড়বে। সুতরাং এখন আপনার কর্তব্য হচ্ছে, প্রথমে তাকে নিজের সম্পর্কে বলতে দিন। কারণ মানুষের স্বভাবজাত চাহিদাও এটা। তাকে ক্রমাগত বলে যেতে দিন আর আপনি শুধু মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকুন। কারণ এর দ্বারা তার মধ্যে যে পুঞ্জিভূত চাপ ও আত্মিক জড়তা আছে, তা আপনি বের করে ফেলতে পারবেন। যখন নিজের সম্পর্কে পর্যাপ্ত কথাবলা শেষ হবে, তখন তার অন্তর স্বস্তি লাভ করবে, মনে প্রশান্তি অনুভব করবে এবং মনের মধ্যে আরামবোধ হবে। এ পর্যায়ে আপনিতো তার আস্থা অর্জনে বিরাট একটি পদক্ষেপ নিলেন। সে যা বলে তা আপনার গ্রহণ করা উচিত এই ভিত্তিতে যে, এটা তার স্বভাবজাত বিষয়। তার প্রদত্ত বক্তব্যকে অনভিপ্রেত মনে করবেন না। অবহেলা করবেন না। কারণ আপনি যদি তার বক্তব্যকে অনভিপ্রেত মনে

করেন এবং 'বোধগম্য নয়' কথার দ্বারা যদি বিরক্তিভাব প্রকাশ করে দেন। তাহলে আপনার এই অনভিপ্রেত মনে করাটা তাকে আপনার সম্পর্কে নেতিবাচক দিকে তার মন নিয়ে যাবে। অতঃপর অন্তর দিয়ে সকল কথাবলা থেকে সে বিরত থাকবে।

আপনার শুধুমাত্র কথার মাধ্যমে দুর্বোধ্য মনে করা, যেমন, 'আপনার বক্তব্য বোধগম্য নয়' অথবা 'এটা কি ঠিক হয়েছে?' অথবা কখনো আপনার চেহারার অভিব্যক্তি পরিবর্তন করে তার মাধ্যমে নিজের বিরক্তি প্রকাশ করলেন। এমতাবস্থায় ঐ ভদ্রলোক ভাববে যে, আপনি তার কথা বিশ্বাস করছেন না ; তখন সে আলোচনা স্থগিত করে দেবে। এবং আপনাকে বলবে, আপনার সঙ্গে অন্য সময় সাক্ষাত করবো। তার সকল বক্তব্যের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আপনাকে অনুভব করাতে হবে আমরা তাদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করছি। তাহলে ভদ্রলোক অনেক কথা বলবে। তার ভিতরে যা আছে তা উদগীরন করার জন্য অনর্গল বলে যাবে সে। যাতে সে দূশ্চিন্তামূক্ত হয়ে আত্মিক প্রশান্তি অনূভব করতে পারে। 'বক্তার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার প্রতি গুরুত্বারোপ করা' একজন দাওয়াত-কর্মীর কাছ থেকে একান্তভাবে কাম্য। কথা হেলান দিয়ে শুনবে না। এমনকি গুরুত্ব না দেয়ার কারণে আপনি তার কথা উপলব্ধি করতে নাও পারেন। আর সে যখন এটা টের পেয়ে যাবে, তখনই সে তার কথা বলা বন্ধ করে দেবে। এবং সে বুঝাতে চেষ্টা করবে যে, অপর বিষয়টা সে একেবারে ভুলে গেছে। বরং কথার গতি তখন অন্য বাঁকে ঘুরিয়ে দেবে। ফলে আপনি দেখবেন, যে বিষয় সে কথা আরম্ভ করেছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয় শুরু করে দিয়েছে।

দাওয়াতের ক্ষেত্রে সভা-সেমিনারের গুরুত্ব অপরিসীম। এ প্রেক্ষিতে আপনার কর্তব্য হচ্ছে-আপনার প্রদত্ত বক্তব্যে তার প্রতি আপনার আন্তরিকতা, ভালোবাসা ও মহব্বতের কথাটা ফুটিয়ে তুলতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ- তার সঙ্গে এমন অবস্থায় আলোচনা জুড়ে দেয়া ঠিক হবে না, যখন আপনি চেয়ারে এবং সে মেঝেতে বসে থাকবে- যাতে সে একথা মনে করতে না পারে যে, আপনার ও তার মধ্যে অনেক ব্যবধান, অথবা মনে করবে আপনি তার উপর কর্তৃত্ব করছেন। এই অভিমতটি ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে নিম্নে আর একটি সহায়ক উদাহরণ দিচ্ছি :

যখন আপনি কোন সরকারী উর্ধতন কর্মকর্তার নিকট যাবেন, তাকে একটি উঁচু চেয়ারে এবং আপনি অপেক্ষাকৃত একটু কম উঁচু চেয়ারে বা ছোট চেয়ারে বসা থাকবেন। অতঃপর আপনি যখন কথা বলবেন-তখন অবশ্যই আপনাকে নিচ থেকে উপরের দিকে লক্ষ্য করতে হবে। এমতাবস্থায় আপনি বেশি কথা বলতে পারবেন না। কারণ আপনি মনে করছেন সে আপনার উপর আধিপত্য বিস্তার করে আছে। উপরন্তু আপনি এটাও উপলব্ধি করছেন যে, সে আপনার উপর অহংকার প্রদর্শনকারী। আপনাদের মধ্যে সম্পূর্ণ ব্যবধানটা তেমন -উঁচু চেয়ার যার উপর সে বসে আছে এবং ছোট আসন যার উপর আপনি বসে আছেন-এ দু'টি আসনের মধ্যে পার্থক্য যেমন। পক্ষান্তরে আপনাকে যদি তার পাশে একই চেয়ারে বসায় অথবা আপনারা দু'জন এক সঙ্গে একই স্তরে বসেন ; তখন সে আপনার বিনয় উপলব্ধি করতে পারবে ও আপনাদের মধ্যে আন্তরিকতা ও ভালোবাসার সৃষ্টি হবে। এটা এমন একটি বিষয় যার প্রতি আমাদের সকলকেই খেয়াল রাখতে হবে।

অতএব এটা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, বসার স্থান ও আসনের সমতা শ্রোতার অন্তরে একটা বিরাট প্রভাব থাকে। সে যদি আপনার সঙ্গে কোন বিষয় কথা বলতে প্রস্তুত নয়, তা সত্যেও এই সুযোগে আপনি তার সঙ্গে কথা বলার প্রস্তুতি নিতে পারেন। সে তাতে সাড়া দেবে। যে সাড়াটা আপনি আসন বৈষম্যের সময় পেতেন না।

জনসাধারনের সঙ্গে কথা বলার জন্য উপযুক্ত সময় নির্বাচন করা কর্তব্য। যেমন-আপনার নিকট যদি একজন লোক এসে বলে, আমার একটি প্রশ্ন আছে, অথচ আপনারা উভয় তখন একটি সংকীর্ণ স্থান অতিক্রম করছেন, অথবা একটি রাস্তার মধ্যে তার সঙ্গে দাড়িয়ে আছেন। এটা কি কথা বলার কোন উপযুক্ত স্থান হলো? অবশ্যই আপনাকে একটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করতে হবে যেখানে আপনার সঙ্গী আপনার বিশেষত্ব উপলব্ধি করতে পারবে। এবং আলোচনার জন্য উপযুক্ত সময় নির্বাচন ও অনুকুল পরিবেশ তৈরী করতে হবে। উভয়ের জন্য উপযুক্ত স্থান, নির্ধারিত সময় ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হবে। যেমন-আপনি তাড়াহুড়া করছেন, এ অবস্থায় কেহ আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করে কথা বলতে চায় ; অতঃপর আপনি তাকে বললেন-আমার একটু তাড়া আছে, আপনার সঙ্গে এ মুহূর্তে কয়েক মিনিটের বেশি কথা বলতে পারছি না। এ অবস্থাতো আপনি কিছুতেই তার হক আদায় করতে পারছেন না। বরং এ ধরনের প্রেক্ষাপটে আপনাকে অন্য একটি সময় বেছে নিতে হবে যেখানে সে বিশেষত্ব অনুভব করবে। এবং উপলব্ধি করতে পারবে-নিশ্চয়ই আপনি তার প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছেন ও তার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে রেখেছেন। আর তখনই আপনি তার আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হবেন। এবং তার অন্তরে আপনার বিশাল প্রভাব পড়বে।

যখন আপনারা উভয়ে এক সঙ্গে বসবেন তখন তার কথার মধ্যে যে বিষয়টাকে সে মুলত বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে তা উপলব্ধি করা আপনার কর্তব্য। বক্তার কথা আপনি সম্পূর্ণ বুঝছেন, এটা তাকে বুঝাতে হবে। আপনার বুঝার প্রমাণ হিসেবে আপনি তার সম্পূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারেন, সে আপনাকে তার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করণের সুযোগ দিয়েছে। আপনি তাকে এভাবে বলতে পারেন- নিশ্চয়ই আপনার এ কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে 'এটা...' , অথবা আপনি এরক বলতে চাচ্ছেন... এরকম..... বলেছেন। তখন সে অনুভব করবে-নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ মনোযোগ সহকারে আপনি তার কথা শুনছেন। এ কারণে সে আপনার সঙ্গে কথা চালিয়ে যাবে আপনার প্রতি তার সৃষ্ট আস্থার সঙ্গে ; যা সৃষ্টি হয়েছে মনোযোগ সহকারে তার ক্রমাগত কথা শ্রবন করার কারণে। এ অবস্থায় তাকে আপনি সম্পূর্ণ প্রশান্ত, ধীর-স্থির ও ফুরফুরে মেজাজে পাবেন। অথবা আপনি তাকে বলতে পারেন, আমার ভুল হলে শুধরে দেবেন- 'আপনি সম্ভবত এটাও বুঝাতে চেয়েছেন। তখন সে আপনাকে উত্তর দেবে, 'হ্যাঁ ; আপনি যা বলেছেন তা ঠিক।' আপনি তখন বলবেন, 'কিন্তু আমি এর সঙ্গে এটা ও সংযোজন করতে চাই ..।'

আপনি যদি হুবহু ঐ শব্দগুলো ব্যবহার করতে পারেন যা সে তার বক্তব্যে প্রয়োগ করেছে ; তাহলে সে আরো বেশী কথা বলবে এবং মনে করবে নিশ্চয়ই আপনি তাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি তাকে কোন অস্পষ্ট কথা বলেন, এ কারনে যে, আপনি তার কথা ভাল করে শুনেননি অথবা আপনি তার সঙ্গে বাক্যালাপ করেছেন সে আপনার কথা বুঝতে পারেনি তাহলে তাকে উপলব্ধি করতে দেয়া যাবে না যে, সে আপনার কথা সে বুঝতে পারেনি। বরং এ প্রেক্ষিতে আপনার কর্তব্য হচ্ছে-তখন এর বিশদ ব্যখ্যা

করে দেয়া; অতএব আপনি তাকে বলতে পারেন ‘আশা করি আপনি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন।’ এটা আপনার প্রতি তাকে আরো সজাগ করবে এবং তার প্রতি আপনার অব্যাহত আনুগত্য বজায় রাখবে, নিজেকে নিরাপদ ভাবতে এবং ক্রমাগত কথা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করবে। আপনি তাকে ক্রমাগত প্রশ্ন করতে থাকুন, কারণ আপনি যদি প্রশ্ন না করেন তাহলে সে তার প্রতি আপনার গুরুত্বহীনতা মনে করে বসবে। এবং বলবে লোকটার নিকট আমি যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলাম সে তার কোন গুরুত্বই দিলো না।

কখনো এমন বিষয় নিয়ে কথা বলতে থাকবে যা আপনি চাচ্ছেন না, উপরন্তু আলোচ্য বিষয়টা আপনি পরিবর্তন করতে চান। তাহলে এ ক্ষেত্রে তা সরাসরি পরিবর্তন না করে, বরং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হবে। আর তা এভাবে করা যেতে পারে, আপনি কৌশলে তাকে অন্য প্রসঙ্গে নিয়ে যাবেন অথচ সে মনে করবে তার বিষয়ে-ই সে আছে। কিন্তু আপনি তার সঙ্গে স্পষ্টবাদী হবেন এবং তাকে উদাত্ত্ব আহ্বান জানাবেন-আলোচ্য বিষয়টা যেন গুরুত্বপূর্ণ ও পরিস্কার হয়। আর একটু অগ্রসর হয়ে তাকে বলবেন ‘তার কাংক্ষিত বিষয়টা যেন অপ্রাসঙ্গিকতা হতে মুক্ত হয়।’ যাতে সে বুঝতে পারে নিশ্চয়ই আপনি তাকে এবং তার বিষয়টাকে খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন।

আলোচনা পদ্ধতি ও সততার বিরাট উপকারিতা

আলোচনা ও বাক্যালাপের পদ্ধতি জানা আপনার কর্তব্য। মানুষের সঙ্গে সততা, সত্যবাদিতা আপনাকে তাদের বিশ্বাস ও আস্থার কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত করবে। এর দ্বারা আপনি হবেন তাদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়। অতএব কখনোই অন্যকে বোকা ঠাওরানোর পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন না। কখনো লোকদেরকে এ জানান দেবেন

না যে, আপনি তাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান, যদি হয়েই থাকেন ঠিক আছে, তবে আপনি একাই বুদ্ধিমান নন-মানুষের মধ্যে তো আরো অনেক বুদ্ধিমান রয়েছে। আপনি যেমন বোঝেন তারাও তো বোঝে। বরং আপনার কর্মতৎপরতা ও তাদের সঙ্গে কথোপকথন পদ্ধতি তারা ধারণ করে রাখে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আপনার কর্তব্য হচ্ছে-আপনার সঙ্গে যিনি কথা বলছেন তাকে বলবেন আপনার কথাগুলো খুবই চমৎকার। কিন্তু আমি এ মুহূর্তে আপনার কথাগুলো গুরুত্ব দিয়ে শুনতে পারছি না। সেহেতু উপযুক্ত ও ব্যাপক সময় নিয়ে আমরা এ আলোচনাটি করতে পারি।

এখন আমাদের দ্বীতিয় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা দরকার ।

তা হচ্ছে :

প্রশ্নের পদ্ধতি :

মানুষের প্রশ্ন করার পদ্ধতি বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে । কেউ করে উম্মুক্ত প্রশ্ন ; উম্মুক্ত প্রশ্ন দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে-যার উত্তর শুধু হ্যাঁ বা না দ্বারা নয়, বরং অনেকগুলো উত্তর হতে পারে। তবে অবশ্যই সেই উত্তরগুলো হতে হবে সংক্ষিপ্ত ও নাতিদীর্ঘ্য। এটা বিশষজ্ঞদের মত (হ্যাঁ অথবা না): কিন্তু উম্মুক্ত প্রশ্ন বলতে সাধারনত তুমি কেমন আছো? বিশেষ করে তোমার পরিবার-পরিজনদের নিয়ে তোমার দিন কেমন কাটছে? সাধারণভাবে ইসলামের অনুসরণ কতটুকু করতে পেরেছো? এর উত্তরে সে ঐ প্রশ্নগুলো সমর্থন করে অথবা অসমর্থন করে কথা বলবে। অথবা এখানে আরো অনেক উত্তর থাকতে পারে । এমনকি আপনি যে উত্তরের অপেক্ষা করছেন তার বিপরীত উত্তরও সে দিয়ে ফেলতে পারে। অতএব আপনি তাকে বলতে পারেন তোমার পরিবারের সঙ্গে তুমি কেমন দিন

কাটাচ্ছো? উত্তরে সে বলবে-আমার পরিবারের অনেক সমস্যা, এবং কথার প্রসঙ্গ অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে যাবে। অর্থ্যাৎ মুলআলোচ্য বিষয়টাই পরিবর্তন করে ফেলবে। সুতরাং এই ভদ্রলোককে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে পারদর্শিতার পরিচয় দিতে হবে। যাকে তারা 'ব্যাখ্যা সাপেক্ষ প্রশ্নমালা' বলে অবিহিত করেছেন-ঐ প্রশ্নগুলো আপনি ব্যবহার করবেন না । কিন্তু প্রশ্ন করার আরো কিছু বিকল্প উপকরণ রয়েছে যা আলোচনাকে প্রানবন্ত করণ, গতিশীলতা আনয়ন ও অধিক বাক্যালাপে সহায়তা করবে। আপনার প্রশ্নগুলো সুস্পষ্ট ভাষায় করবেন ; এভাবে বলবেন, 'হ্যাঁ, এ বিষয় সে আমার সঙ্গে অনেক আলোচনা করেছে। অথবা তার কথার সংশ্লিষ্ট কোন একটা অংশের দিকে ইঙ্গিত করবেন, যার নিশ্চয়তা প্রদান ও ব্যখ্যার প্রয়োজন। অতঃপর তার কথার বৃদ্ধি কামনা করবেন।

কখনো একথা বলে আপনি তার দৃষ্টি আকর্ষন করতে পারেন, 'তোমাকে তো আজ খুব বিষন্ন ও কিংকর্তব্যবিমুর মনে হচ্ছে ! উত্তরে সে বলবে-কার্যত আমি হতবুদ্ধি ও দিশেহারাই বটে ; কারণ আমি এ রকম, এই রকম...... । দেখেন ! আপনি এখানে তেমন কিছুই বললেন না এবং আপনি এও জানতেন না যে বাস্তবিকই সে পরিশ্রান্ত কি না । কিন্তু আপনার উক্ত মন্তব্যে আপনার গুরুত্ব সে ঠিকই উপলব্ধি করে নিয়েছে। আবার কখনো বা সে পূর্ব থেকে ক্লান্ত নাও থাকতে পারে ; কিন্তু আপনার এই উক্তি যেন তাকে বিষন্ন ও পরিশ্রান্ত-ক্লান্ত করে ফেলেছে। তখন এর উত্তরে সে আরো সংযোজন করে বলবে-আমাকে পরিশ্রান্ত করে দিয়েছে এটা .., এটা...। মনে হচ্ছে আপনি যেন তার অনুভুতির উপর আঘাত করেছেন । সে এখন বেশ কথা বলতে থাকবে ।

ইসলামের দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত প্রত্যেকটি ব্যক্তির এটা শিখে নেয়া একান্ত কর্তব্য, যাতে তার সম্মুখস্থ ব্যক্তি তার সমস্যা ও বিষয়াবলী সম্পর্কে যে কথা বলছে-তার সঠিক সমাধান দিতে পারে।

উদাহরণঃ তার অনুভূতির উপর মন্তব্য করতে গিয়ে এভাবে বলতে পারেন-আজ তোমাকে খুব ফুরফুরে মেজাজে ও প্রফুল্ল লাগছে । উত্তরে সে বলবে-আল্লাহর কসম, আমি এ রকম..., আমি সে রকম... সফলতা অর্জন করেছি। অতঃপর সে বলবে আপনিতো খুব তাড়াতাড়ি সংবাদটা জেনে ফেললেন। এরপর তার সুত্রধরে (উদাহরণ স্বরূপ) বলবে ; আজ আমার একটি নবজাতক জন্ম গ্রহণ করেছে। অতঃপর আপনি তাকে বলতে পারেন, 'এইমাত্র আমি তোমার আনন্দের মুল কারণটা জানতে পারলাম।' ইতিমধ্যে আপনাদের পরস্পরের মধ্যে আলোচনা, ভালবাসা ও শুভেচ্ছা বিনিময় আরম্ভ হয়ে যাবে। ইসলামের দাওয়াত প্রেক্ষিতে এর ব্যাপক ভূমিকা অনস্বীকার্য।

কিছু অর্থহীন শব্দ ও মুখের প্রকাশভঙ্গী রয়েছে। যেমন কেহ কথা বলতে থাকলে আপনি তাকে লক্ষ করে বলবেন ; (আহ) , (উহ্), এই প্রকাশ ভঙ্গির মাধ্যমে আপনি বক্তাকে মনে মনে বলছেন 'আপনি একজন ভালশ্রোতা।' (জি) (হ্যাঁ) এর দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য হবে-আলোচনা চালিয়ে যান, আমি আপনার সঙ্গে আছি, আপনার কথা শুনছি। আর একটি উদাহরণ হতে পারে দুরালাপনীতে কথোপকথন : যখন বক্তা কথা বলতে আরম্ভ করবে, বিবরণ দেবে ও এক কথার মধ্যে অন্য কথা টেনে আনবে ; এ অবস্থায়ও আপনি কোন মন্তব্য ছাড়া একেবারে চুপ করে থাকবেন। তখন যদি সে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে বসে, 'আপনি কি আমার

কথা শুনছেন?' উত্তরে আপনি বলবেন, 'হ্যাঁ , আমি তোমার কথা শুনছি', এবং তার আলোচনার শেষ বাক্যটা পুনরাবৃত্তি করে দেবেন। ফলে সে আপনার নাম লিপিবদ্ধ করে নেবে এবং আপনাকে অনেক নম্বর দেবে। তখন আপনি বলবেন, 'হ্যাঁ, এই বক্তব্যটা গতরাতে রেডিওতেও প্রচারিত হয়েছে।' মানুষের বেশি কথা আদায় করার ক্ষেত্রে এই অর্থহীন শব্দগুলোরও বিরাট প্রভাব রয়েছে। কারণ মানুষ সাধারনত এই অর্থহীন বাক্য ও কথা থেকে সু-নির্দিষ্ট প্রকাশভঙ্গি ব্যক্ত করে থাকে।

মানুষ আপনার কাছে সমস্যা নিয়ে আসে সমাধানের জন্য। কখনো এই সমস্যাগুলো ছোট হয়, আবার কখনো হয় বড়। তা যাই হোক, তার প্রতি অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে এবং যেটার সমাধান করতে পারছেন না তার জন্য একটা অঙ্গীকার করবেন। এ ক্ষেত্রে আপনার কর্তব্য হচ্ছে-স্পষ্টভাবে বলে দেয়া। 'আমি এ সমস্যার সমাধানে আপনার সাহায্যের জন্য আমার সাধ্যমত সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো।' কারণ আপনি যদি সময় বেধে দেন, অথবা এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য কোন প্রতিশ্রুতি দেন -অথচ এ দু'এর কোনটিই পূর্ণ করার সামর্থ্য আপনার নেই- তখন আপনি অসুবিধায় পড়ে যাবেন এবং লোকটির আস্থা হারাবেন, যা আপনি প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে তার সঙ্গে বেধে রেখেছিলেন। তখন আপনার সম্পর্কে সে বলবে, 'ভদ্রলোক ওয়াদা করে তা রাখে না।' এ সবকিছুর পরও আপনি যদি তাকে আশ্বস্ত করতে পারেন যে, নিশ্চয়ই আপনি আপনার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবেন এবং যদি কাংক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেন তাহলেতো খুবই ভাল কথা। সে তার কাংক্ষিত বস্তু পেয়ে গেলে সে মনে করবে নিশ্চয়ই আপনি তার সঙ্গ দিচ্ছেন, তাকে সাহায্য সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। তবে মনে রাখতে হবে

সে যতক্ষণ আপনার শরনাপন্ন থাকবে-আপনি কখনোই কোন সমস্যার মধ্যে তাকে একা ফেলে যেতে পারবেন না ।
আপনার জেনে রাখা দরকার যে, মানুষ তাদের অসুবিধা ও সমস্যাবলীর কথা বলতে সদা উদ্গ্রীব থাকে । সর্বদা তাদের এমন একজন লোকের প্রয়োজন যিনি তাদের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, তাদের সঙ্গে নম্র আচরণ করবেন এবং তাদের সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভুমিকা রাখবেন। শুধুমাত্র এই ভূমিকা বা তাগাদাটাই আপনাকে তাদের মুল্যায়ন ও আস্থার পাত্র বানাতে সক্ষম। এমনকি যদি আপনার এই ভূমিকা ও তাগাদা শুধুমাত্র মৌখিকই হোক না কেন। শুধূ গুরুত্ব দিয়ে তার অবস্থাটা জিজ্ঞাসা করা আপনাকে তার আস্থা ও বিশ্বাসের পাত্রে পরিণত করতে পারে, যদি আপনি তার কোন ইতিবাচক সহযোগিতা করতে নাও পারেন । অতএব প্রমাণিত হল-একটি মিষ্টি কথা মানুষের হৃদয়কে খুব গভীরভাবে আকর্ষণ করে ।
মানুষ যা শুনে তা দ্বারা প্রভাবিত হয় : আমি এখন তার একটি উদাহরণ দেবো : আমি যখন সর্বপ্রথম ব্রিটেন গিয়ে মসজিদের নিকটে বসবাস করার জন্য একটি বাসা খোঁজ করছিলাম, এ উদ্দেশ্যে একটি মসজিদের নিকট গেলাম এবং ভাড়া নিয়ে বসবাস করা যাবে এমন একটি বাসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম । তখন ঐ মসজিদে অবস্থিত এক ভদ্রলোক আমাকে সালাম দিল এবং আমার হাতে একটি ঠিকানা দিয়ে বলল ; এই ঠিকানায় একটি ইসলামী কন্ফারেন্স আছে। আমি বললাম-আরে ভাই ! আমি ভাড়া নেয়ার জন্য একটি বাসা খুঁজছি। অথচ আপনি আমাকে বলছেন-ঐখানে একটি ইসলামী কন্ফারেন্স আছে। আমি আরো বললাম, 'আমি ঠিকানাটা নেবো।' অতঃপর সে বলল, আমি এ এলাকার বাসিন্দা

নই, তাই এ ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারছি না ।’ হয়ত সে এই এলাকার কিছুই চেনে না । অথবা সে প্রশ্নটাই বুঝতে পারেনি কিংবা সে এর প্রতি কোন গুরুত্ব দেয়নি । তবে আমাকে কনফারেন্সের তথ্য দেয়ার জন্য আমার প্রশ্নটাকেই সুবর্ণ সুযোগ মনে করেছে এবং তা কাজে লাগিয়েছে ।

মানুষের অভাব ও প্রয়োজনের মুল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় । উপরোক্ত ক্ষেত্রবিশেষে তা দাওয়াত ও উপদেশের চেয়েও বেশি গুরুত্বের দাবীদার । কারণ এই পাঠের জন্য দাওয়াত মানুষের কল্যাণ ও সৌভাগ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত । মানুষের সৌভাগ্য অর্জিত হয় তার প্রয়োজনে সাড়া দেয়া ও কল্যাণের পূর্ণতাপ্রাপ্তি থেকে । আপনি যখন তার স্বার্থ পুরণ করে দেবেন, তাহলে সে আপনার যে কোন ডাকে সাড়া দিতে প্রস্তুত থাকবে । কারণ আপনি তার আগ্রহ সৃষ্টি করেছেন অথবা তাকে এমন সেবা প্রদান করেছেন যা তার নেহায়েত প্রয়োজন ছিল । আর সে কারণেই আপনি তার শ্রদ্ধা ও আস্থার পাত্র হয়ে গেলেন ।

কেউ বা কখনো আবার নিজের সম্পর্কে আলোচনা জুড়ে দেয় এবং দীর্ঘায়িত করে ফেলে । সে যদি বুঝতে পারে যে, আপনি কথার সমর্থন করছেন না, তাহলে কথা বন্ধ করে দেবে । তবে হ্যাঁ , যদি অনূভব করে আপনি তাকে সমর্থন বা তার কথা সত্যায়ন করছেন তাহলে নিশ্চয়ই সে আপনার প্রতি আস্থাশীল হবে ও আপনার সঙ্গে অনেক কথা বলবে । আপনি তার কথাগুলো এভাবে সমর্থন করতে পারেন : তার সমস্যার অনুরূপ ঘটনা আপনার অথবা আপনার সঙ্গীদের বেলায় ঘটে গেল ।

কখনো আবার আপনি মানুষের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তাদেরকে বলবেন- আমার নিকট একজন ভদ্রলোক এসে আমাকে

এই, এই...সম্পর্কে বিবরণ দিল। কার্যত ঘটেছেও তাই । কখনো আবার সেই ভদ্রলোক ঐ তথ্যাবলীর সঙ্গে অপরকে সম্পৃক্ত করতে চায় না । আপনি ব্যতীত অন্য কারো কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ- আপনার সঙ্গে যেভাবে আলোচনা করেছে হুবহু ঐ শব্দেই শুনে তাহলে সে হতচকিত হয়ে যাবে। এই শব্দগুলোও তার অনুভুতিতে আঘাত করতে পারে অথবা সেটা তার একান্ত ব্যক্তিগত গোপন বিষয়ও হতে পারে ; অথবা কোন পদস্খলন যা তার থেকে সংঘটিত হয়ে গেছে। অতএব আপনার সঙ্গে যে কথা বলেছে তার গোপনীয়তা রক্ষার নিশ্চয়তা আপনাকেই দিতে হবে। এমনিভাবে আপনি সকল কথা জানতে পারবেন, তার সমস্যা ও বিষন্নতার অনেক কথা শুনতে পারবেন ।

ব্যক্তিগত সাক্ষাতের সময় আপনার সম্মুখস্থ লোকটির কোন সেবা করার চেষ্টা করা আপনার নৈতিক দায়িত্ব- যে সেবাটা সে পেতে চায়। এবং আপনিও তার সেবা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন-এ ভাব দেখিয়ে আপনি তাকে সম্ভাব্য সহযোগিতা করবেন। তবে যদি আপনি তার সহযোগিতা করতে না পারেন, তাহলে কমপক্ষে যে সহযোগিতা করতে পারবে এমন একজন লোকের সন্ধান দিন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বানীর অনুসরণ করে অপরের সেবায় তৎপর থাকা আপনার কর্তব্য ।

أن أسعى بحاجة أخي خير من أن اعتكف شهرا. (رواه الطبراني في معجمه الكبير وخرجه الألباني في السلسلة الصحيحة)

“আমার ভাইয়ের প্রয়োজন পুরনে প্রচেষ্টা চালানো আমার নিকট একমাস ই’তিকাফ করার চেয়েও উত্তম ।”

অপরের সেবার প্রয়াস দাওয়াতী কাজে বিরাট ভুমিকা রাখে। কারণ আপনি এর মাধ্যমে তাদের হৃদয়কে প্রভাবিত ও তাদের ভালোবাসা কুড়াতে পারবেন। সে কারণে তা একমাস ই'তিকাফ করার চেয়েও উত্তম বলা হয়েছে। কারণ যে ব্যক্তি মানুষকে নিঃস্বার্থ সেবা দিয়ে যায়, সে-ই তাদের ভালোবাসা পায় ও আস্থা অর্জন করতে পারে। অতএব মানুষের আস্থা ও শ্রদ্ধা অর্জনের পর সে যদি মানুষের কাছে কিছু চায়, তা যাই হোকনা কেন ; তাদের সামর্থ্য থাকা সত্যেও তার আবেদন প্রত্যখ্যান করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

কিভাবে মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করবেন?

প্রভাব বিস্তারের মুল প্রধান ও প্রথম স্তর হচ্ছে আস্থা অর্জন। আর তা অর্জিত হবে কতিপয় সেবা প্রধানের মাধ্যমে যা ইতিপুর্ব উল্লেখ করেছি। আস্থা অর্জন মানুষের মধ্যে ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের জন্ম দেয়। অতএব যে আপনাকে ভালোবাসবে সে অবশ্যই আপনার আনুগত্য করবে। কারণ প্রভাব বিস্তারে ভালোবাসা অত্যন্ত শক্তিশালী, সক্রিয় ও কার্যকর মাধ্যম। যেমন একটি প্রসিদ্ধ কথা আছে :

إن المحب لمن يحب مطيع

'অবশ্যই প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের আনুগত্য করে।'

এখানে অন্ধ আনুগত্য কখনোই আমাদের কাম্য নয়। যে আনুগত্য অন্ধ ভালোবাসা থেকে সৃষ্টি হয় তা কোন দোষ-ত্রুটি দেখে না। কারণ যে অন্ধের মত আনুগত্য করে সে আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে আমরা এমন যুবসমাজ এবং ব্যক্তিদের চাই, যারা ব্যক্তিত্বের

স্বাধীনতা, মুক্তচিন্তা, পরিচ্ছন্ন মতামতের স্বাধীনতা ও সত্যের ব্যপারে সাহসিকতার পরিচয়ে অনন্য। অপরের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় যে গুণটি তা হচ্ছে উত্তম আদর্শ। শুধু কথা ও উপদেশ দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হয় না। শুধুমাত্র কথামালা ও উপদেশ কি করতে পারবে? যখন মানুষ এমন কোন আদর্শ দাওয়াত-কর্মী পাবে না যে উক্ত উপদেশ প্রথমে নিজের উপর প্রয়োগ করতে ও নিজ জীবনে বাস্তবায়নে যত্নবান হবে। যখন সে নিজেই তার কাজকর্ম ও আচার-ব্যবহারে অপরের জন্য আদর্শ নয় ; তখন মানুষ তা দেখে কি তার পদাঙ্ক অনুসরন করবে ?

আপনি যখন ভুল-ক্রুটি অথবা উপদেশ সংক্রান্ত আলোচনা করার সংকল্প করবেন, তখন আলোচনায় অন্য লোকদের প্রতি 'ইঙ্গিত পদ্ধতি' ব্যবহার করা কর্তব্য। যেমন আপনি বলতে পারেন-আল্লাহ তা'আলা চেয়েছেন অমুক ব্যক্তি এটা...করুক। আপনি যদি তার মেজাজ বোঝেন এবং জানতে পারেন যে, সামান্য একটু প্রশংসা পেলে সে অধিক নেক কাজ করতে বেশ উৎসাহিত হবে। তখন আপনি কেন তার প্রশংসা করবে না? আর মানুষের স্বভাব সর্বদা এরকমই হয়ে থাকে যে, সে নিজের প্রশংসা পেতে ভালবাসে। আপনি দেখতে পাবেন লোকজন তারই প্রশংসা করছে যে, সে এ . .টা করেছে, সে সে. . .টা.করেছে তখন তা তার কাছে খুব ভালো লাগবে। কেউ কেউ মনে করেন এটা একটা ভালো উদ্যোগ।

আবার কখনোবা কেউ বলেও ফেলতে পারেন 'আমি কি শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করছি না মানুষের জন্য কাজটি করছি?' কিন্তু মানবস্বভাব অপর মানুষের মন্তব্য শোনার জন্য সর্বদা উৎকর্ণ থাকে। সুতরাং সে নিজের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করার জন্য

দৃঢ়ভাবে সংকল্পবদ্ধ হয়ে কষ্ট স্বীকার করবে। কারণ, তার একটাই উদ্দেশ্য মানুষ যেন তার দিকে সুন্দর ও ভালো দৃষ্টিতে তাকায়। এর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরন হচ্ছে-সালেম বিন আব্দুল্লাহ বিন ওমর বিন খত্তাব কর্তৃক তার পিতা হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী। তিনি এরশাদ করেন:

نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى الليل، قال سالم : فكان عبد الله آنذاك لا ينام الليل إلا قليلا. (متفق عليه)

'যদি রাতে নামাজ আদায় করত আব্দুল্লাহ রা. তাহলে সে কত ভালো মানুষ হতে পারতো।' সালেম বলেন, 'তখন থেকে আব্দুল্লাহ রা. রাতে খুব সামান্যই ঘুমাতেন।' তিনি এ কথাটা আব্দুল্লাহ কে এভাবে বললেন না, 'তুমি রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করো না' অথবা 'তুমি কেন তাহাজ্জুদ আদায় করছো না?' তিনি বলেছেন, 'আব্দুল্লাহ রা. কত ভালো লোক হতো যদি সে রাতে নামাজ আদায় করতো !' তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আব্দুল্লাহর রা. সকল গুণই উত্তম হয়ে যেত যদি এই আমলটিও সে করতে পারতো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে শুধুমাত্র এই একটি আমলকেই চিহ্নিত করেছেন যা তিনি আব্দুল্লাহ রা. থেকে প্রত্যাশা করতেন। তিনি মানুষের প্রশংসা অনুসন্ধান করেননি। কিন্তু যখনই কোন দোষ-ক্রুটি দেখেছেন অমনি তা ইঙ্গিত পদ্ধতি প্রয়োগে শোধরাতে চেষ্টা করেছেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সরসরি তিরস্কার কিংবা শাস্তি প্রদানের পথ অবলম্বন করেননি ; ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

আপনি প্রত্যাদেশ পদ্ধতিও প্রয়োগ করতে পারেন এবং তা এভাবে যে, আপনি তাকে সরাসরি দোষরোপ করবেন না, বরং কৌশলে তার মনোযোগ অন্য দিকে নিবদ্ধ করে দেবেন।

আপনি নিশ্চয়ই কোন বইতে পড়ে থাকবেন যে, 'এক ভদ্রলোক ব্যাপক উপকারিতা সমৃদ্ধ একটি বক্তৃতা তৈরী করেছেন। যার মধ্যে প্রচুর তথ্য-উপাত্ত ও বহু জ্ঞান, অভিজ্ঞতা সন্নিবেশিত হয়েছে। কিন্তু সেটা ছিল খুব দীর্ঘ্য। সে তার স্ত্রীর কাছে এসে এই বক্তৃতা সম্পর্কে মতামত চাচ্ছে। তার স্ত্রী ইতিমধ্যে জানতে পেরেছে যে, এই বক্তৃতাটি খুব দীর্ঘ হয়েছে, এ প্রেক্ষিতে যদি এটা জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপন করে, তাহলে এর মধ্যে সন্নিবেশিত তথ্য-প্রমাণ ও গবেষণার প্রাচুর্যের কারণে শ্রোতারা ঘুমিয়ে পড়বে এবং তাদের উপর কোন প্রভাব পড়বে না। মানুষ তার স্বভাবজাত কারণেই দীর্ঘসুত্রিতা পছন্দ করে না। কারণ মানুষ ত্বরাপ্রবণ। অর্থবহ, ফলপ্রসূ এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনা তাদের কাম্য। কিন্তু ভদ্রমহিলা এ কথাটি তাকে সরাসরি বলে দেননি। বরং তিনি বলেছেন, 'এই বক্তৃতাটা যেন এক বিশাল গ্রন্থ যা মর্মস্পর্শী প্রবন্ধ হওয়ার সামর্থ্য রাখে।' তার কথায় থেকে সে বুঝে নিয়েছে যে, এটা বক্তৃতার উপযুক্ত হয়নি। এ কথাটি বুঝাতে এখানে অবশ্যই ইঙ্গিত পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে।

এমনিভাবে এটাও একটি উদাহরণ হতে পারে, আপনার নিকট কেউ একটি সারগর্ভ বিষয় অথবা একটি কাব্যগাথা নিয়ে এসে বলতে পারে 'এটা প্রকাশ করতে পারেন।' তখন আপনি বলবেন, 'এটা কোন সংক্ষিপ্তগল্পের আসরের উপযুক্ত হবে যা মানুষের হাসির খোরাক যোগাবে।' এই বাকপদ্ধতির মাধ্যমে সে বুঝে নিতে পারবে যে, ওটা ছাপানোর যোগ্য নয়। অথবা আপনি বলতে পারেন, 'এই

কবিতাটি সত্যিই অনন্য। এই বিষয়টা অদ্বিতীয় ও উপকারী ; আপনি যদি এটা অমুক স্থান থেকে ছাপাতে পারতেন।' মোট কথা এজাতীয় প্রেক্ষাপটে আপনার কর্তব্য হচ্ছে ; প্রথমে ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরা, অতঃপর তাকে সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদান। মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের এটাও একটি অন্যতম পদ্ধতি যে, নেতিবাচক বিষয়ের পুর্বে তাদের সামনে ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরা। যেমন আপনি বলতে পারেন, 'এটা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার উপর আমাদেরকে বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা উচিত। এটা শোনা আমাদের জন্য সহজ, কিন্তু এ বিষয়টির উপর কি ভাবে আমরা প্রশিক্ষণ নেই?' অথবা বলতে পারেন, 'এটা খুবই সহজ বিষয়, তবে আমাদেরকে একটু সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ নিতে হবে।'

এ প্রসঙ্গে আমি আরো কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি : এক ভদ্রলোক আমার নিকট এসে একটি প্রশ্ন করলে আমি তাকে বললাম-আপনি অমুক আলেমকে জিজ্ঞাসা করতে পারতেন, তিনিতো আপনি যেখান থেকে এসেছেন সেই শহরেই থাকেন। সুতরাং তিনিই তো আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন। তখন ভদ্রলোক বলল, 'জনাব ! ঐ আলেমের নিকট আমি কোন প্রশ্ন করলে সে আমার সঙ্গে বিরক্তি প্রকাশ করে। তার কাছে প্রশ্নকারীদের প্রশ্নের এমন স্তুপ পড়ে যায়, যা নিয়েই সব সময় তাকে ভীষণ ব্যস্ত থাকতে হয়, যা অন্য প্রশ্নকারীকে বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে ফেলে দেয়। তিনি সেখান থেকে এসে তাদের দিকে একটু ফিরে তাকানোর ফুরসতও পান না। এমনকি তাদের সঙ্গে একটু কথা বলতে পারেন না।' এর একমাত্র কারণ, প্রশ্ন ও তার বাহককে অবমুল্যায়ন ও তার নির্লিপ্ত ব্যস্ততা পদ্ধতি।

হে দায়ী ভাই ! প্রশ্নটা যদি অগোছালো হয় তাহলে আপনার কর্তব্য হচ্ছে-প্রশ্নটিকে সাজিয়ে নিয়ে তার মধ্য হতে ইতিবাচক দিকগুলো খুঁজে বের করা এবং প্রশ্নের বাক্য আপনার পদ্ধতিমত পরিবর্তন করে নেয়া। এবং তাকে বলুন! (উদাহরণ স্বরূপ) 'হে ভাই ! আমি মনে করি আপনার প্রশ্নের উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা, এটা... ।' মানুষ তার অজানা বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করে তার জ্ঞান বৃদ্ধি করবে, এটা একটি মহান ব্রত। আমাদের সকলেরই বিশেষভাবে জানা দরকার, নিশ্চয়ই একজন আলেম মনের বিশালতায়, জ্ঞান ও অনুগ্রহের স্বাচ্ছন্দ্যবোধে সর্বোত্তম মানুষ। সে কারণেই তিনি অপরের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করতে পারেন। যখন একজন আলেম প্রশ্নকারীর ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরবেন এবং প্রশ্ন করার জন্য তার প্রশংসা করবেন। তাহলে এটা-ই প্রশ্নকারীর অন্তরে গ্রহণযোগ্য হওয়ার অন্যতম কারণ হবে।

উদাহরণ আপনি তাকে এভাবে বলতে পারেন, তোমার প্রশ্নটা ভাল, কিন্তু তার স্থান এটা নয়। যেহেতু আমরা এখন আলোচনা করছি অন্য বিষয়ে; আর তা হচ্ছে-এই... । পরে অন্য সময় তোমার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করবো।

অন্য একটি উদাহরণ : আমি এক ভাই এর সঙ্গে হারাম শরীফে অবস্থান করছিলাম। আমরা ফজর নামাজ আদায়ের জন্য বের হলাম, ইত্যবসরে অন্য এক জন আমাদেরকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, ভাই! আমার একটি প্রশ্ন আছে। তা হল, রমজান মাসে দিনের বেলা রজঃনিঃস্বরণরত অবস্থায় আমার স্ত্রীকে নিয়ে আরাফায় গমন ঠিক হবে কি ? হজ্জের মৌসুম নয়, এমন সময় এটা একটি অনভিপ্রেত ও অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। আমি উত্তরে বললাম, 'একজন ঋতুবতী মহিলার জন্য যেখানে মসজিদে হারামে প্রবেশ এবং

আল্লাহকে স্মরণ করার অনুমতি আছে ; সেখানে কি করে আপনি তাকে আরাফায় প্রবেশ নিষেধ করতে পারেন? অথচ সেটাতো একটি পূণ্যময় প্রান্তরমাত্র। কোন মসজিদও নয়।' অতঃপর সে যখন বুঝতে পারল আমি প্রশ্নটা খুব কঠিনভাবে নিয়েছি ; তখন সে বিব্রতবোধ করল ও মনে মনে ভীষণ লজ্জিত হল। এরপর বললাম, 'আরাফাহ কোন মসজিদ নয়। আপনি তাকে সঙ্গে নিয়ে যান। এমনকি মসজিদে হারামে হলেও ...।' তবে আমি কিছুক্ষণ পর আমার সঙ্গীকে বললাম, দেখ, কিভাবে আমাদের অবসরটুকু নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল অথচ আমরা তা থেকে কোন রকম উপকৃত হতে পারছিলাম না। আমার সর্বাগ্রে এই লোকটার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কারণ সে উক্ত অবসরের মুল্যায়ন করেছে, এবং দ্বীন সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তরে পরিতুষ্ট হয়েছে। এরপর সে অন্য কোন প্রশ্ন করে আমাদেরকে লজ্জা দেয়নি। এ হচ্ছে এমন কিছু বিষয়বস্তু যা অর্জন করতে প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের দরকার হয়। এই প্রেক্ষাপটে এই দাবী আমরা জোর দিয়ে করতে পারি, 'নিশ্চয়ই মানুষের সঙ্গে আচার-ব্যবহারে উত্তম পদ্ধতি প্রয়োগ অন্ত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। অতএব দাওয়াতের ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে আচার-ব্যবহারে মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি হতে আমাদের উপকৃত হওয়া কর্তব্য। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র 'হ্যাঁ' অথবা 'না' দ্বারা উত্তর প্রদান যথেষ্ট নয়। অনেক ভাই আছেন যে খুব বেশী ত্বরাপ্রবন। যখন তার সঙ্গে কোন ভদ্রলোক বা প্রশ্নকারী কথা বলে আর যদি তার কথার অংশ বিশেষে অথবা সুচনাতেই ত্রুটি থাকে, তখন সে ঐ ত্রুটি বর্ননায় খুব তাড়াহুড়ো করে ; ফলে এ প্রশ্নকারী ভদ্রলোক তাকে বলে -'আপনি খুব তাড়াহুড়ো করছেন। আপনি আমার কথা শেষ পর্যন্ত শুনেননি।' সে কারণে দাওয়াতে নিয়োজিত ব্যক্তিকে বিনম্র চরিত্রের অধিকারী

হওয়া কর্তব্য। যদি হতে পারে তাহলে সঠিক কথা চয়ন ও বাছাই করতে পারবে। যেমন- তাকে আপনি বলতে পারেন 'তোমার কথা সঠিক, আমি তোমাকে সমর্থন করি, বিশেষ করে সেই অংশে যেখানে তুমি এ রকম.., এ রকম... বলেছো।' সুতরাং পদ্ধতিটার প্রয়োগই হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ; যা মানুষের সঙ্গে কথোপকথনের কাজটা সহজ ও সম্ভব করে দেবে। ফলশ্রুতিতে তারা আমাদের কথাগুলো গ্রহণ করে নেবে।

মানুষকে তার বুদ্ধি অনুযায়ী সম্বোধন করা

দাওয়াতের ক্ষেত্রে মানুষকে তার বুদ্ধি অনুযায়ী সম্বোধন করা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ আমরা বিশ্বাস করি বুদ্ধির বিচিত্রতা ও বুঝের মধ্যেও তারতম্য রয়েছে। সুতরাং সকল মানুষ একই পরিমাণ মেধা ও ধীশক্তির অধিকারী নয়। অতএব সকল মানুষের সঙ্গে একই মানের আলোচনা করলে সেটা আপনার ভুল হবে। তাহলে প্রথমেই আপনাকে মানুষের শ্রেণি ও তাদের বুদ্ধির পরিধি জেনে নিতে হবে। আপনার নিকট প্রশ্নকারী লোকটির প্রশ্নের ধরন-গঠন, তার শিক্ষা ও জ্ঞানের পরিধি অথবা চাকুরীর মান দেখে খুব সহজেই আপনি তার শ্রেণিবিন্যাস করে নিতে পারবেন। আলী বিন আবু তালেব রা. বর্ণিত তিনি বলেন, 'মানুষের সঙ্গে তাদের পরিচিত বিষয় নিয়ে আলোচনা কর। তোমরা কি এটা পছন্দ করবে যে, আল্লাহ তাআলা ও তদীয় রাসুলকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হবে?' তাঁর এ কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের সঙ্গে আপনি এমন বিষয় নিয়ে কথা বলবেন, যেটা তারা বুঝতে পারে। কারণ আপনি যদি এমন বিষয় নিয়ে কথা বলেন যা তার বুদ্ধির পরিধির বাহিরে, তখন সে নিশ্চয়ই এ কথা

বলে ফেলবে, ‘এটা আমার বোধগম্য নয়, এ কথা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেননি।’ আলী রা. এর এ বাণী ইমাম বুখারী র. তার কিতাবে বর্ননা করেছেন। ইবনে মাসউদ রা. এর বাণী হতে ইমাম মুসলিম র. এর বর্ননা এ রকম, ‘আপনি যদি কোন সম্প্রদায়কে এমন একটি কথা বলেন, যা তাদের বোধগম্য নয়, তাহলে এটা তো তাদের মধ্য হতে অনেককেই বিভ্রান্তিতে ফেলে দেবে।’ অর্থ্যাৎ আপনি যদি মানুষের সঙ্গে এমন কথা বলেন, যা তাদের বোধ ও বুঝের স্তরভূক্ত নয়, তখন অনেকের জন্য এই কথাটা তার দীনের ব্যপারে বিভ্রান্তির কারণ হবে । কারণ এই বিষয়টা তারা আয়ত্ত্ব করতে পারেনি।

কিভাবে ত্রুটিপূর্ণ গবেষণা পদ্ধতি সংশোধন করা যায়?

আপনার সম্মুখে অবস্থিত ব্যক্তিকে যদি ভুল পদ্ধতিতে চিন্তা-ভাবনা করতে দেখেন, তখন আপনি কিভাবে তার চিন্তা-ভাবনাকে নির্ভুল ও উত্তম পদ্ধতিতে পরিবর্তন করে দেবেন-যে পদ্ধতিটা আপনাকে তার নিকট গ্রহণযোগ্য করতে সক্ষম। ফলশ্রুতিতে তার অন্তকরণে আপনার প্রতি গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি হবে এবং তার বুদ্ধিমত্বায় আপনার সক্রিয় প্রভাব পড়বে? সেটা এভাবে হবে- তাকে এবং তার গবেষণা পদ্ধতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রেখে আপনি চিন্তা-গবেষণার সঠিক দিকনির্দেশনা দিন এবং তার সামনে গবেষণার ত্রুটিপূর্ণ দিকটা তুলে ধরুন! কিন্তু সে যদি এতটুকুতেই সেটা পরিবর্তন করে নেয়, তাহলে উত্তম। তবে সে যেন মনে কষ্ট না নেয় সে দিকে আবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। আপনি তার চিন্ত া-ভাবনার দৃষ্টিভংগির সাথে টক্কর লাগাবেন না। এবং সর্বদা তার মস্তিস্কে এ বিশ্বাস স্থাপন করতে চেষ্টা করুন যে, আপনিই হচ্ছেন

সংশোধন ও দিক-নির্দেশনার আধার। জেনে রাখুন! এই মানুষটিকে কল্যাণকর বিষয়ের দিকনির্দেশনা প্রদান ব্যতিরেকে আপনার উদ্দেশ্য কখনোই সফল হবে না। তাকে একজন স্বভাবিক মানুষ (যে দ্বীনের অনেক মৌলিক বিষয়ের প্রতি উদাসীন) থেকে পরিবর্তন করে ইসলামের সেবায় নিবেদিতপ্রান একজন উদ্যমী মানুষে পরিণত করার প্রয়াসই আপনার সর্বোচ্চ লক্ষ্য হওয়া উচিত। যে ইসলামের সেবা ও তার লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে নিজের সকল যোগ্যতা, প্রতিভা ও গবেষণা নিয়োজিত করবে। সেক্ষেত্রে আপনার জন্যও মহা পূরুস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে।

এ প্রেক্ষাপটে কেউ বা আবার বিরাট ভুল করে থাকেন। যেমন- ব্যাপকতর করণ বিষয় ; অনেকে আছেন তার জীবনে অথবা কোন কাজে একটি ভুল যদি সে করে ফেলে, তখন গোটা পৃথিবীটা তার চোখে অন্ধকার হয়ে যায় এবং বিশ্বাস করে সকল কাজেই সে ব্যর্থ ও অকৃতকার্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, অনেক ভাই আছেন, যারা সাময়িক সময় পর্যন্ত দাওয়াতি কাজ করার উদ্দেশ্যে কিছু কর্মসূচী হাতে নিয়ে থাকেন। অতঃপর ‘পাঠদান’ বিষয় দিয়ে শুরু করেন (তবে অবশ্যই সেই পাঠের বিষয়বস্তুটা মানুষের অবস্থা, মন-মানসিকতা এবং তাদের ধারণ ক্ষমতার অনুকুল হতে হবে) অথচ এরপরও কাংক্ষিত সংখ্যক মানুষ তার পাঠদানে সাড়া দেয়নি। এ কারণে তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেন-‘আমি এ কাজের উপযুক্ত নই।’ আপনার কর্তব্য এ ভদ্রলোককে দিকনির্দেশনা দেয়া। আপনি তাকে বলতে পারেন, ‘ভাই ! আপনি পুরোপুরি উপযুক্ত।’ এবং আপনার এ কথা ভুলে গেলে চলবে না, আপনি গেল বছর এটা উপস্থাপন করেছেন, এবং এর দু’বছর পূর্বেতো আপনি এই,

এই... বিষয় পেশ করেছিলেন। আর এটা একটি উত্তম ও মহান কাজ।

আপনি এর দ্বারা উক্ত ধারণাটা অথবা তার ত্রুটিপূর্ণ চিন্তা-ভাবনার দৃষ্টিভংগি সংশোধন ও সুন্দর করে দিতে পারেন। পক্ষান্তরে কিছু লোক আছে যারা শূধুমাত্র নৈতিবাচক দিকটা উল্লেখ করতেই সদা তৎপর থাকে ; এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও অনভিপ্রেত ব্যপার। তারা ইতিবাচক দিকগুলো উল্লেখ করতে চায় না, অথচ ইতিবাচক দিকের আলোচনা মানুষের মধ্যে সৎকাজের আগ্রহ সৃষ্টি করে, ব্যক্তিসত্ত্বা ও মূল্যবোধ জাগ্রত করে। উপরন্তু তাকে এ বিশ্বাস করতে শেখায় যে, সে এই সমাজেরই একটি সফল ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

অনেক লোক এমনও আছে যে, তার নিকট কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির আলোচনা হলে সে বলে উঠে-'সে একটি খারাপ লোক, তার মধ্যে এই, এই..... খারাপ দোষ আছে এবং সে কোন কাজেরই যোগ্য নয়।' এটা আসলেই একটা আশ্চর্য্যজনক ব্যপার ! এই নেতিবাচক দিক ও ত্রুটিগুলো ব্যতীত কি আর কোন কিছুই নেই এই মানুষটির জীবনে? সে কি এ.... ভাল কাজগুলো করেনি? আমাদেরকে ইতিবাচক দিকগুলো খুঁজে বের করতে হবে। অতঃপর যখন আমরা সকল ইতিবাচক দিকগুলো সংগ্রহ করতে পারবো, তখন বুঝতে পারবো এই ভদ্রলোক ঠিক কোন কাজটির জন্য উপযুক্ত। আর এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা সামর্থ্য ও সম্ভাবনা নির্ণয় করে তাকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে সক্ষম হবো। সমাজে বহু লোক আছে, যারা অপরের দিকে শুধু কু-দৃষ্টিতেই তাকায়। অপরকে তারা সদাসর্বদা কালো চশমা দিয়ে দেখে। অতএব এদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো-সকল মুানষই খারাপ। কারোর মধ্যেই কোন কল্যান নেই ; বরং তারা সকলেই এই দীন থেকে বহু দুরে। সুতরাং হে ভাই! এই

শ্রেণির মানুষদের আপনাকেই দিকনির্দেশনা দিতে হবে। তার আশ-পাশের ভাল বিষয়গুলোর বিবরণ দিতে হবে। তাকে বলুন- ইসলামের দিকে অগ্রসরমান এই প্রত্যয়ী যুবক ও মসজিদসমূহের স্থাপনার দিকে লক্ষ কর ! সেই মুসলিম যুবতীদের দিকে তাকাও ! যারা সাক্ষাত সকল কঠিন পরিস্থিতি উপেক্ষা করে সর্বস্থানে হিজাবের নির্দেশকে আঁকড়ে ধরেছে। এই উম্মতের মধ্যে কল্যাণ ও মঙ্গল সর্বকালে বিদ্যমান থাকবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রসঙ্গে এরশাদ করেন:

الخير فيَّ وفي أمتي إلى يوم القيامة

"আমি এবং আমার উম্মতের মধ্যে কেয়ামত অবধি কল্যাণ বিদ্যমান থাকবে।"[২] এই মুল্যবান আলোচনার মাধ্যমে আপনি চিন্তা-ভাবনার পদ্ধতি সংশোধন করতে পারবেন এবং এই কু-লক্ষণে মানুষটিকে আপনি সুলক্ষণে রূপান্তরিত করে আশাবাদী লোকের সাড়িতে নিয়ে আসতে পারবেন।

কিছু লোক আছে যারা জাগ্রত অবস্থায়ও স্বপ্নে বিভোর থাকে। বাস্তবতার গন্ডির বাইরে জীবন যাপন করে ; এবং বিশ্বাস করে তারাও একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আছে এবং খুব সামান্য প্রচেষ্টায় অচিরেই দীনের জন্য এই, এই...বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করবে। এই লোকগুলোর আছে শুধূ কতগুলো অর্থহীন প্রত্যাশা। কিন্তু সে প্রত্যাশাগুলো বাস্তব পৃথিবী থেকে বহুদূরে। অতএব আমাদের কর্তব্য হচ্ছে-তাদেরকে এই অবাস্তব স্বপ্ন থেকে জাগ্রত করতে হবে

---

[2] المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله (نكمل يوم القيامة سبعين أمة نحن آخرها وخيرها)
صحيح ابن ماجة

যাতে তারা বাস্তব জীবনে ফিরে আসতে পারে এবং বুঝতে পারে কাজটা অত সহজ নয়, কষ্টসাধ্য বটে। অনেক লোক এমনও আছে যারা কোন বিষয়ের মূল প্রতিপাদ্য থেকে দুরে থেকে তার খুঁটি-নাটি দিক ও ছাল-বাকলকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। প্রবাদ আছে- 'গাছ ছেড়ে তার পাতা নিয়ে ব্যস্ত।' ঐ সকল লোকদের মন-মানসিকতা প্রশিক্ষণ দিয়ে সংশোধন করা আপনার কর্তব্য। যাতে তাদের দুর্বলতার বিষয়টা আপনি জানতে পারেন ; অতঃপর তা চিহ্নিত করে পরিবর্তনের ব্যবস্থা নিতে পারবেন। শুধু এতটুকুই নয়, বরং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে- দাওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তির ব্যক্তিসত্ত্বাকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া, যাতে সে নিজের ভিতর থেকেই নিজেকে প্রশিক্ষণ দিয়ে পরিবর্তন করতে পারে, যাতে করে জ্ঞানের কথা ও উত্তম উপদেশ নিজের থেকেই গ্রহণ করতে পারে। যখন তার অন্ত রকে আপনি এর জন্য তৈরী করতে পারবেন, তখন আপনি দেখতে পাবেন, সে নিজেই ইসলামের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রশ্ন করে জানার চেষ্টা করছে। তবে এর জন্য আপনাকে প্রচুর শ্রম দিতে হবে।

অনুকুল পরিবেশ তৈরী কর

যে ব্যক্তিকে আপনি সম্বোধন করছেন, তার নিকট গ্রহণযোগ্যতা পেতে এবং আপনার নিশ্চিত প্রভাব বিস্তার করতে হলে অবশ্যই আপনাকে উপযুক্ত সময় নির্বাচন করতে হবে। প্রথমেই নিশ্চিত হয়ে নেবেন-কাংক্ষিত উপদেশ শ্রবনের জন্য সে সম্পূর্ণ প্রস্তুত কিনা। আপনি যদি এটা নিশ্চিত হতে না পারেন তাহলে পরিবেশ তৈরী করে তাকে প্রস্তুত করে নেন। আর সেটা এভাবেও হতে পারে, যেমন-আপনি তাকে বলবেন, আচ্ছালামু আলাইকুম। উত্তরে সে

আপনাকে স্বাগতম...ধন্যবাদ বলবে। এখন আপনি তার সঙ্গে ইসলামের ক্ষুদ্র একটি বিষয়-সালামের শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে আলোচনা শুরু করতে পারেন-তার নিকট স্পষ্ট করে দেবেন যে, অপেক্ষাকৃত উত্তম বাক্যে সালামের উত্তর প্রদান একজন মুসলমানের অন্যতম দায়িত্ব। সে ক্ষেত্রে স্বাগতম, মারহাবা ইসলামী সালাম এর সমকক্ষ নয়। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন:

وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا

"আর তোমাদেরকে যদি সালাম দেয়, তাহলে তোমরাও তাকে সালাম দাও; তার চেয়ে উত্তম পন্থায় অথবা তারই মত করে।"[৩] আপনি এর দ্বারা আলোচনার পথ তৈরী করে নেবেন এবং ভালবাসার রশি শক্ত করে বেধে নেবেন। এরপর আপনি উপদেশ প্রদান করতে পারবেন। এভাবে আপনি তার নিশ্চিত গ্রহণযোগ্যতা পাবেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ

এখানে কিছু প্রনিধানযোগ্য বিষয় রয়েছে যা সর্বাগ্রে উল্লেখ করার প্রয়াস পাবো : সরাসরি উপদেশ প্রদান রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অভ্যাস ছিল না। বরং তিনি অন্য বিষয় দ্বারা সেটাকে প্রস্তত করে নিতেন। কখনো বা কোন জানা বিষয় প্রশ্ন করার মাধ্যমে আরম্ভ করতেন অথবা একটা বিষয় দ্বারা অন্য

[৩] সূরা আন-নিসা, আয়াত - ৮৬

বস্তুর দিকে ইঙ্গিত করতেন। যেমন তিনি একবার একজনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বললেন :

قد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه

'তুমি একটি মহান বিষয় প্রশ্ন করেছো, তবে আল্লাহ তাআলা যার উপর সহজ করেছেন তার জন্য এটা অবশ্যই সহজ।' অর্থাৎ তোমার এই প্রশ্নটা অত্যন্ত গুরুত্বের দাবীদার। তুমি আরাম করে বস এবং মনোযোগ দিয়ে শোন!

تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة وتوتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت.

'আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তার সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না, নামাজ কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমজান মাসে রোজা রাখবে এবং বাইতুল্লাহর হজ করবে।'

আবার তিনি অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। উৎসাহ ও উদ্দীপনা প্রদান পদ্ধতির দিকে মনোনিবেশ করলেন, যাতে করে বক্তব্যটা অন্তরের মধ্যে অর্থবহ ও কার্যকর প্রভাব ফেলে। যেমন তিনি বললেন:

ألا أدلك على أبواب الخير عامة؟ . . الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا قوله تعالى : تتجافى جنوبهم عن المضاجع.

'আমি কি তোমাদেরকে ব্যাপকতর কল্যাণের পথসমুহ বাতলে দেবো না ? বললেন, 'রোজা হচ্ছে ঢাল স্বরূপ, সদকা পাপরাশী

মোচন করে দেয় যেভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয় এবং গভীর রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ। অতঃপর তিনি আল্লাহ তাআলার বানী তেলাওয়াত করলেন, 'তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে।'
কখনো তিনি বলেছেন এভাবে :

ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه

'তোমাকে কি ধর্মীয় বিষয়গুলোর মূল, তার স্তম্বসমুহ ও শীর্ষ চুড়া সম্পর্কে সংবাদ দেব না?"

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উৎসাহ প্রদান করার জন্য ভিন্ন একটি পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। যার অর্থ দাড়ায় এ রকম যে, তুমি ইতিপূর্বে তুমি যা শুনেছো ব্যাপক কল্যাণের পথ সম্পর্কে তারপরেও সকল কাজের শীর্ষবিন্দু হিসাবে বিবেচিত ও তোমার শ্রুত বিষয়ের চেয়ে উন্নত আরো কিছু আছে। এ কথার মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষার্থীর মাথায় এমন একটা বিদ্যানুরাগ ঢুকিয়ে দিলেন, যা তাকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শ্রবন করার যোগ্য করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। উত্তরে শোতারা বলল, 'হ্যাঁ, অবশ্যই বলুন ; হে আল্লাহর রাসুল! তখন রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন:

رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد

"সকল কল্যাণের মুল বা মাথা হচ্ছে ইসলাম, তার স্তম্ভ হলো নামাজ এবং জিহাদ হল তার শীর্ষচূড়া।"

এরপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

ألا أخبرك بملاك ذلك كله

“আমি কি তোমাকে এই সবগুলোর ধ্বংসকারী সম্পর্কে অবহিত করবো না?”

অর্থাৎ ধর্মের মুল, স্তম্ভ ও শীর্ষ চূড়া সম্পর্কে তুমি যা কিছ শুনলে এ সবকিছুর পরও একটি বিষয় রয়ে গেছে, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যা এগুলো শেষ করে দেয়। সে সম্পর্কে আমি কি তোমাদের সংবাদ দেবো না?’ তারা বলল, ‘অবশ্যই বলুন, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।’

অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জিহ্বাটি চেপে ধরে বললেন:

أمسك عليك هذا

“এটা খুব সংযত করে রেখ।”

শ্রোতা বলল, ‘হে আল্লাহর রাসুল! আমরা যত কথা বলি সে সকল কথার জন্য কি আমাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে?’ তিনি বললেন,

ثقلتك أمك يا معاذ! وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟

“হে মুআয ! তোমার মা তেমার জন্য বিলাপ করুক! লোকদেরকে কি তাদের রসনার অর্জন ব্যতীত অন্য কিছু তাদের অধমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে?” (তিরমিযী বর্ণিত হাদিস)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথা-বার্তা, শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ, তার মন ও মস্তিস্ককে জাগ্রত করণ এবং যে উপদেশ, জ্ঞান ও সংবাদ পরিবেশন করার ক্ষেত্রে, তার প্রতি অনুপ্রেরনা দানে বিভিন্ন রকম পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। যেমন দেখুন রাসুলুল্লাহ'র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বানী:

ألا اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم؟ (صحيح الجامع)

"তোমাদেরকে কি আমি এমন বস্তু শিক্ষা দেবো, যার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের নাগাল পেতে পারো?" এরকম কথা শোনার পর স্বভাবতই আমরা পরস্পর জিজ্ঞাসা করতে থাকি ; সেই মহান কাজটি কি যা করতে পারলে আমরা বিশাল মর্যাদা, বিনিময় ও পুরস্কারের দিক থেকে আমাদের পূর্ববর্তীদের পর্যন্ত পোঁছতে পারবো? অনুরূপ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আর একটি বাণী :

ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة (صحيح الجامع)

"আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতের খাজানাসমূহের থেকে একটি খাযানার কথা বলবো না?" আমাদেরকে এক সঙ্গে লক্ষ রাখতে হবে, আলোচনায় উৎসাহ ও প্রেরণাদান পদ্ধতি, পদ্ধতির বিভিন্ন ধরণ এবং শ্রোতার মন ও অবস্থা অনুযায়ী ধীরতা অবলম্বনের দিকে। প্রথম শিক্ষক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মধ্যেই রয়েছে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। আমরা যদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসসমূহ অুসন্ধান করি। তাহলে দেখতে পাবো কিভাবে তিনি কালজয়ী হয়েছেন এবং সম্প্রতিক কালে আধুনিক প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে কঠিন সাধনা করে

অর্জিত বিভিন্ন বিভাগে বিশেষজ্ঞ মনীষিদের উপর কি করে প্রধান্য বিস্তার করে গেছেন ।

ব্যক্তিত্বের নিরুপন

এখানে আমাদের আর একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয় রয়ে গেছে, আর তা হচ্ছে- আমরা কিভাবে মানুষের ব্যক্তিত্বকে নির্ণয় করবো ও কিভাবে তা চিনবো? এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পূর্বে আমাদের জানতে হবে ব্যক্তিত্বটা কি?

মানব ব্যক্তিত্ব সেটা রকমারি বৈশিষ্ট্য ও বিচিত্র শক্তির মুল, যার দ্বারা প্রত্যেকটি মানুষকে অন্যদের থেকে আলাদা করা যায় । অথবা নির্দিষ্ট গুনাবলী যার দ্বারা একজন গুনান্বিত, অন্য জন নয় । এই বৈশিষ্ট্য ও গুনাবলী মানুষের কর্মতৎপরতা ও তার উপর সংঘঠিত ঘটনা প্রবাহ থেকে চয়নকৃত হবে । আমরা লক্ষ করবো সে মানুষের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করছে? বিভিন্ন ঘটনার সম্মুখীন হলে সে কি ভাবে কর্মতৎপরতা চালায় । তার দৃষ্টিভঙ্গি কি এবং ঝোক কোন দিকে? চাই সেটা উত্তরাধিকার সুত্রে জন্মগত হউক বা অর্জিত ; তাও আমাদেরকে লক্ষ রাখতে হবে । প্রত্যেকটি মানুষের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বতন্ত্র আকর্ষণ থাকতেই পারে, থাকাটাও জরূরী । তবে প্রকাশ্য নিদর্শন তাকে অন্যদের থেকে পৃথক করে দেয় । এই ভদ্রলোক আবেগপ্রবন, দ্রুত রেগে যায় ; কিন্তু সে মানুষের সঙ্গে বিনম্র, স্বভাবত সে কাউকে কষ্ট দিতে চায় না । এটা তার একটা ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য । তবে তার কতিপয় সাধারণ গুণও আছে, যা অন্য মানুষের মধ্যেও পাওয়া যায় । যথা-ক্রোধ, অনুমাননির্ভরতা,

ত্বরাপ্রবনতা ও তাড়াহুড়ো। আর এগুলো মানুষের স্বভাবজাত সাধারন প্রবনতা ।আল্লাহ তাআ'লা এরশাদ করেন:

وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا

"মানুষ ত্বরাপ্রবন।" (সূরা আল-ইসরা - ১১)
কিন্তু এর সাথে সাথে স্বভাবের ভিন্নতা রয়েছে। যেমন-আমরা প্রত্যেকেই ক্রোধান্বিত হই, ক্রোধের স্তর, কারণসমুহ একজনের থেকে অন্যজনেরটা আলাদা। একজন খুব দ্রুত ক্রোধান্বিত হয়ে যায়, আর একজন একান্ত অনন্যোপায় না হলে ক্রোধান্বিত হয় না। অতএব তাকে কেউ ক্রোধান্বিত অথবা চাপ প্রয়োগ না করলে সে রাগ করে না। এমনিভাবে মানুষের মধ্যে অধৈর্য ও অনুভূতি প্রবণতার শ্রেণির মধ্যেও বিচিত্রতা রয়েছে, আরো রয়েছে অতিরঞ্জিত ভাবও যুক্তিযুক্ত পরিমাণের মধ্যে তারতম্য।
ব্যক্তিত্বের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন: ধৈর্য - নের্তৃত্ব প্রদানের যে সকল গুণাবলীর প্রয়োজন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ধৈর্য ; যাতে করে মানুষের সঙ্গে তার বুদ্ধির পরিমাণ অনুযায়ী সে ব্যবহার করতে পারে। এবং মানুষের পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করার জন্য একেবারে কঠিন থেকে কঠিনতর মুহুর্তেও ধৈর্যের সঙ্গে দায়িত্বভার বহন করতে পারে। একজন মানুষ অন্য মানুষের সঙ্গে যখন সমাজে একসাথে জীবন যাপন করবে, তখন সে তাদের ব্যক্তিত্বসমুহ সনাক্ত করতে পারবে ; তাদের সম্পর্কে জানতে পারবে। নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে দীর্ঘ্যভ্রমন, একসঙ্গে নিকটে থেকে বসবাস ও অবস্থানের মাধ্যমেও ব্যক্তিত্ব সনাক্ত করা সম্ভব। বিশেষ করে -উদাহরণ স্বরূপ- ব্যবসা বানিজ্য ও সম্পদের বিনিময় দ্বারা। একসঙ্গে বসবাস ব্যক্তিত্ব নিরুপন করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

কারণ আপনি যখন নির্দিষ্ট সময় বসবাস করার পর কোন লোকের ব্যক্তিত্ব নির্ণয় ও ব্যক্তিত্ব সনাক্ত করতে পারেন, তাহলে সে ক্ষেত্রে আপনার সিদ্ধান্ত ও নিরুপন নির্ভুল ও সঠিক হবে। পক্ষান্তরে আপনি যদি শুধু পথে সাক্ষাতের মাধ্যমে প্রথম আবেগের উপর নির্ভর করে ব্যক্তিত্ব সনাক্ত করে ফেলেন এবং সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেন তাহলে সেটা হবে ভুল।

ভদ্রলোকটির উপর আপনার আরোপিত প্রশ্ন দ্বারাও আপনি তার ব্যক্তিত্ব সনাক্ত করতে পারেন। কোন প্রশ্নকারী যখন আপনার নিকট যে কোন বিষয় বা নির্দিষ্ট একটি সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন করতে আসে, প্রথমেই আপনি তার প্রশ্নগুলো পর্যবেক্ষণ করুন ! যেমন আপনি বলতে পারেন-'আপনি কোন শ্রেণিভূক্ত মানুষ? যাদের চিন্ত াভাবনার দায়িত্বভার আছে তাদের মধ্য হতে, নাকি যাদের কোন চিন্তাভাবনার দায়িত্বভার নেই তাদের মধ্য হতে আপনি?' যদি সে স্পষ্ট ও দৃঢ়তার সাথে উত্তর দেয় যে, যারা নিজের সহায়তা করতে পারে সে ঐ শ্রেণিভূক্ত, তাহাল আপনি তাকে একভাবে মুল্যায়ন করতে পারেন। অথবা তার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনদের থেকে - যারা তার সঙ্গে বসবাস করে- জিজ্ঞাসা করেও আপনি তার ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত করে নিতে পারেন। যেমন-সরাসরি নয় এমন একটি প্রশ্ন আপনি তাকে করতে পারেন ; 'ভাই! আপনার এত অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব কেন?' উত্তরের মধ্য দিয়ে সে তার সকল গুণাবলীর বিবরণ দিয়ে দেবে । কখনো আপনি তার নিন্দুক অথবা শত্রু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। কারণ নিঃসন্দেহে প্রতিটি মানুষ-বিশেষ করে সে যদি জীবনে সফল ব্যক্তি হয়-তার জন্য হিংসুক-নিন্দুক আর শত্রুর অভাব হয় না। অথবা নিন্দুক ও শত্রুরা তার সম্পর্কে কি বলে তা জেনে নিতে পারেন। এই সকল উত্তর ও কথামালার

মধ্য দিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলীর পর্যাপ্ত সংগ্রহ আপনার হাতে এসে যাবে, যা দ্বারা আপনি ব্যক্তিত্বের একেবারে সুক্ষাতিসুক্ষ গুণটিও নির্নয় করতে পারবেন ।

তবে এমন এক শ্রেণির মানুষ আছে যাদের সঙ্গে একটু ভিন্ন রকমের আচরণের প্রয়োজন হয় : যেমন-

স্বেচ্ছাচারী প্রকৃতির মানুষ : কোন দিন আপনি যদি তাকে উগ্র মেযাজে অথবা অস্বাভাবিক দেখতে পান, তখন স্বেচ্ছাচারের কারণ জানতে চেয়ে আপনি নিজেকে বিপদে ফেলবেন না। কারণ সে এরকম-ই ।

ইতস্ততকারী ব্যক্তি : যে একা কখনই সাধারণ বা বিশেষ-কোন ব্যাপারেই কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না ; তার নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেয়ার ব্যাপারে আপনি তাকে সহযোগিতা করতে পারেন ।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সকল সাহবীদের রা. পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন -যাদের সঙ্গে তিনি জীবন যাপন করেছেন। উপরন্তু তিনি যাদের সঙ্গে জীবন যাপন করেননি, তাদের পরিচয়ও শুধুমাত্র সংবাদ ও অবস্থা শ্রবনের মাধ্যমে জানতে সক্ষম হয়েছেন। রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন :

يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها.

‘হে আব্দুর রহমান বিন সামুরাহ ! নেতৃত্ব চেয়ে নিয়ো না, কারণ চাওয়া ব্যতীত নেতৃত্ব প্রদান করা হলে তোমাকে সে ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা হবে ।’[৪]

আব্দুর রহমান বিন সামুরাহ নেতৃত্বের নিকটবর্তী হওয়ার কারণে বা নেতৃত্ব চাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়ায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন । এ দ্বারা প্রমাণিত হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্বভাব সম্পর্কে জেনে শুনে নিয়েছেন । আবু যার রা. থেকে বর্নিত, রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন:

يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، إني أحب لك ما أحب لنفسي . . . لا تأمرن على اثنين.

‘হে আবু জর! আমি তোমাকে দুর্বল মনে করি, তোমার জন্য তা-ই পছন্দ করি যা আমি নিজের জন্য পছন্দ করি । তুমি কখনো নেতৃত্ব করবে না তা দু’জনের উপরে হলেও ।’[৫] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন তার ব্যক্তিত্ব খুবই দুর্বল, কাজেই তিনি নের্তৃত্ব সামাল দিতে পারবেন না । শুধুমাত্র এই জন্যেই কথাটা তিনি বলেছিলেন ।

ব্যক্তিত্ব নির্ণয়ে রাসুলুল্লাহ’র অন্যতম পদ্ধতি সম্পর্কে আরো দৃষ্টন্ত আছে । যেমন, একজন সাহাবী এসে বললো, ‘হে আল্লাহ’র রাসুল! আমাকে উপদেশ দিন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ‘তুমি রাগ করবে না ।’ সে আবার বললো, ‘আমাকে উপদেশ দিন ।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

---

[৪] বুখারী ও মুসলিম

[৫] মুসলিম

'তুমি রাগ করবে না।' আবার সে বললো, আমাকে উপদেশ দিন! তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি রাগ করবে না।' যাতে সে বুঝতে পারে যে, এই দোষটা তার মধ্যে প্রবল।

আর একজন সাহাবী এসে বললো, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে উপদেশ দিন!' তিনি তাকে আল্লাহর জিকির করার উপদেশ দিলেন।

এখানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে : দুইজন প্রশ্নকারী একই প্রশ্ন করল অথচ তাদের উভয়ের উত্তর অথবা উপদেশের মধ্যে কেন পরিবর্তন আনা হল? কারণ, 'উপদেশ নিছক কথা নয়, অনন্তর তা হচ্ছে বর্নমালায় নোক্বতা প্রদান অথবা উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত কথা বলার নাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা আমাদের নিকট স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের অসংখ্য গুণের বিবরণ দিয়েছেন, বিভিন্ন সময়। তিনি বলেন :

أفضل أمتي أبو بكر، وأشدهم في الله عمر، وأكثرهم حياء عثمان، وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأقربهم إليَّ زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة : أبو عبيدة عامر بن الجراح. (الترمذي وأحمد)

"আমার উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট ব্যক্তি আবু বকর, আল্লাহর ব্যাপারে সবার চেয়ে কঠিন উমার, সর্বাপেক্ষা লজ্জাশীল উসমান, কুরআন সর্বাপেক্ষা ভাল তেলাওয়াতকারী হল উবাই বিন কা'আব,

আমার সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তি যায়েদ বিন সাবিত এবং হালাল হারামের ব্যাপারে সর্বাধিক বিজ্ঞ হল মুআজ বিন জাবাল। সাবধান ! প্রত্যেক জাতির একজন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তি থাকে, আর আমার উম্মতের বিশ্বস্ত ব্যক্তি হচ্ছে-আবু উবাইদাহ আমের ইবনুল-যার্‌রাহ।[৬]

প্রতিটি গোত্র, সম্প্রদায় ও জাতির স্বভাব-প্রকৃতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও চরিত্র-বৈশিষ্ট্যাবলী আপনাকে জানতে হবে, এবং নির্ণয় করতে হবে সেই ব্যাপকতর গুণগুলো যা তাদের সকলের মধ্যে সমান ভাবে পরিলক্ষিত হয়। যাতে আপনি তাদের সঙ্গে স্বার্থক ভাবে লেনদেন করতে পারেন। কতিপয় সম্প্রদায় ও জাতি এমন, যাদের কিছু সু-নির্দিষ্ট স্বভাব ও গুণাবলী আছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় যখন ওমরাহ ব্রত পালন করতে আসলেন, তখন কাফেররা সে বছর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওমরাহ ব্রত পালন করতে বাধা দিয়েছিল। ঘটনার বিবরণ : কাফেররা সর্ব সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিল, তাদের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি পাঠাবে, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে আলাপ-আলোচনা করে তাকে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হবে। অতঃপর বনু কেনানাহ'র এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে বলল, 'আমাকে দায়িত্ব দিন, আমি গিয়ে সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে আসি। রাসুলুল্লাহ'র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট যখন লোকটি আগমন করল, এবং তিনি জানতে পারলেন যে, এ ব্যক্তি বনু কিনানার অমুক ; আর ঐ গোত্রের লোকজন উটকে সীমাহীন ভক্তি করে। রাসুলুল্লাহ

[৬] আহমাদ ও তিরমিজী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আগন্তকের পথের নিকটতর প্রান্তরে অথবা নিশ্চিত ভাবে সে যে উপত্যকা অতিক্রম করবে- সেখানে উট ছেড়ে আসতে নির্দেশ করলেন। এরপর সে যখন আগমন করল, সাহাবায়ে কেরাম তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় তাকে স্বাগত জানালো। এবং সে দেখতে পেল উটগুলো বাধা অবস্থায় উপত্যকায় বিচরণ করছে। সে বুঝে নিল বাইতুল্লাহ শরীফে নাজরানা পেশ করার জন্য এই উটগুলো আনা হয়েছে ; অতএব সে খুব গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়লো এবং বলে উঠলো এদেরকে বাইতুল্লাহ শরীফে ঢুকতে বাধা দেয়া উচিত হবে না। অতঃপর সে তার সঙ্গীদের নিকট ফিরে গেল। অতঃপর তারা তার কর্মতৎপরতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে-আমি তাদের উটগুলো বাধা এবং প্রতীক লাগানো অবস্থায় দেখেছি। সে কারণে তাদেরকে বাইতুল্লাহ থেকে ফিরিয়ে দেয়া আমি সঙ্গত মনে করিনি।

এখানে আমাদেরকে বিশেষভাবে লক্ষ করতে হবে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সম্প্রদায় সম্পর্কে সংগৃহিত এই তথ্যাবলী কত সফলভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছেন। সে কারণে আলাপ-আলোচনা ও সেখানে ব্যয়িত পরিশ্রমের দায়িত্বটা তিনি নিজের কাঁধে নিয়েছেন।

রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য একটি তথ্য থেকেও উপকৃত হতে সক্ষম হয়েছিলেন, যখন তিনি জানতে পারলেন- ইথিওপিয়ায় একজন ন্যায়পরায়ণ রাজা আছে। তিনি যখন দেখতে পেলেন-মুমিনদের উপর অত্যাচার-নিপীড়ন ও শাস্তির মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলছে, কাফেরদের অবরোধের কারণে তাদের জন্য

পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে গেছে। সে কারণে তারা একটু শান্তিতে আল্লাহর ইবাদত পর্যন্ত করতে পারছে না।

এহেন নাজুক পরিস্থিতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ইথিওপিয়ায় হিজরত করতে নির্দেশ দিলেন। যেহেতু সেখানে একজন খৃষ্টান রাজা আছে, যার নাম নাজ্জাশী। তার নিকট কেহ অত্যাচারিত হয় না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য-তোমরা যে কষ্টের মধ্যে আছো তা হতে- মুক্তির কোন পথ বের করে দেবেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চিত সত্য বলেছেন, সম্রাট নাজ্জাশী কোরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ঈমান নিয়ে পালাতক সাহাবীদের আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং তাদের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করেছিলেন। অতঃপর তারা নিরাপদে সেখানে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত-বন্দেগী করতে থাকেন। উপরোক্ত নাজ্জাশী ও মনে মনে ঈমান গ্রহণ করেছিল। তার পরলোক গমনের সংবাদ জানার পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য গায়েবানা জানাযা পড়েছেন।

মানুষের আচার-ব্যবহার ও তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখা ও অত্যন্ত প্রয়োজন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে আবর্জনা ফেলানোর অপরাধে এক কাফেরকে মসজিদের খুটির সঙ্গে বেধে রেখে ছিলেন তাকে শাস্তি দেয়ার জন্যে। আর লোকজন নামাজ পড়তো, মসজিদে প্রবেশ করতো ও বেরিয়ে যেত আর সে শুধু তাদের দিকে তাকিয়ে থাকত। কিছুদিন পর অবশ্য সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। কারণ, সে মুসলমানদের সুন্দর আচরণ, ভ্রাতৃত্ববোধ ও মসজিদের প্রতি শ্রোদ্ধাবোধ গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে।

উত্তম চরিত্র ও সৎস্বভাবের মূল্যায়ন করার গুরুত্ব

দাওয়াতের ক্ষেত্রে উত্তম চরিত্রের মূল্যায়ন করা এবং তার প্রতি প্রেরণার সঞ্চার করা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এটা মানবহৃদয়ে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে এবং ভাল কাজ ও নন্দিত আচরণের জন্য তাকে আরো গতিশীল হতে উদ্বুদ্ধ করে। কাল্পনিক কিংবা রূপকথার থেকে ধার নিয়ে নয়, বরং গুরুত্বের জন্য আমাদের সামাজিক জীবনে সংগঠিত ঘটনা থেকে তার উদাহরণ পেশ করছি : বর পক্ষ সকল আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ জানিয়ে বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করল । আমরা সকলেই জানি এতে তাদের কত শ্রম ঝড়াতে ও কষ্ট করতে হয়েছে। কারণ, এখন তারা আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বন্ধবদের সম্মুখে যাচাইয়ের পাত্র। সবাই তাদের আতিথেয়তা ও ব্যবস্থাপনার উপর মন্তব্য করবে। সুতরাং তারা স্বীয় সাথ্যের ক্ষেত্রে কোন ত্রুটিই রাখে না। যেহেতু সুন্দর ও উৎকৃষ্ট সেবা প্রদান একমাত্র উদ্দেশ্য। তবুও তাড়াহুড়ো, সময়ের স্বল্পতা ও মানসিক টেনশনের দরুন আয়োজক কিংবা পরিবেশনকারীদের সামান্য ভুল-চুক হয়ে যাওয়া বা দু-একটি আইটেম ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক। সেখানে কারো কারো উপর কেয়ামত বয়ে যায়, ক্রোধে সজোরে হুংকার করে উঠে। উপস্থিত উৎকৃষ্ট খানার পসরার কথা পর্যন্ত ভুলে যায় সে, উপরন্তু পরিশ্রকারীদের পরিশ্রমটুকুও অস্বীকার করে বসে। এটা কোন যুক্তিসঙ্গত কাজ?

এ জাতীয় প্রেক্ষিতে ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরে উৎসাহ দেয়া উচিত। ত্রুটি বিচ্যুতিগুলোর পুনরাবৃত্তি না করা। তবেই তারা

সামনের কাজে ক্রমাগত উৎকর্ষ সাধন, সংশোধন ও শোধরানোর অনুপ্রেরনা লাভ করবে ।

যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসাজ ইবনে আবদে কায়েসকে উৎসাহ প্রদানের জন্য বলেছিলেন :

إن فيك خصلتين يحبهما الله : الحلم والإنائة . (رواه مسلم)

"তোমার মধ্যে দু'টো গুণ রয়েছে যা আল্লাহ পছন্দ করেন : ধৈর্য ও দৃঢ়স্থিরতা ।" আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, যখন চরিত্র দু'টো ভদ্রলোকের মধ্যে বিদ্যমান তখন তা উল্লেখ করার আবশ্যক কি? এর উত্তর : ইতিবাচক দিক বা ভাল গুণের উল্লেখ আলোচিত ব্যক্তিকে গভীর থেকে নিজের নৈতিবাচক দিকগুলো অনুসন্ধানে তৎপর ও সক্রিয় করে তুলবে । সে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের লক্ষ্যে উত্তম গুণাবলীতে আরো সমৃদ্ধ হতে সচেষ্ট হবে । অন্যরাও এরকম প্রশংসার জন্য উদগ্রীব থাকবে এবং এর মর্যাদায় উন্নীত হতে চেষ্টা করবে ।

এ ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসৃত পদ্ধতিটি হচ্ছে অভিনব, ফলপ্রসূ ও অত্যন্ত কার্যকর । তিনি কারো মধ্যে অনুকরণ যোগ্য গুণ, ভাল স্বাভাব ও সুন্দর নীতির প্রমাণ পেলে উত্তম উপাধি, সুন্দর সুন্দর নাম ও উপনাম দিয়ে আখ্যায়িত করতেন । যার ভেতর তাদের অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে উঠত এবং তারা নিজেরাও এর কারণে গর্ববোধ করতেন, ঈর্ষণীয় হতেন অন্যদের কাছে । এভাবেই সবার সামনে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে যেত উত্তম চরিত্রের মহত্ব, মূল্য ও গুরুত্ব । যেমন তিনি খালিদ বিন ওয়ালীদ রা.-কে 'সাইফুল্লাহ আল-মাসলূল, উসমান

বিন আফ্ফন রা.-কে 'জিন্নু-রাইন' উমার বিন খাত্তাবের রা.-কে 'আল-ফারুক' এবং আবু উবাইদাহ ইবনুল যাররাহ রা.-কে 'আমিনুল উম্মাহ' বিশেষণ দ্বারা আখ্যা দিয়েছেন। অবশ্যই এখানে মহান উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। ফলশ্রুতিতে তারা এবং তাদের সমসাময়িকরা নিজের জান-প্রাণকে ইসলামের জন্য উৎসর্গ করার নিমিত্তে উদ্দীপ্ত হয়েছেন। এবং জীবন, সাধনা ও সম্পদ ইসলামের দাওয়াতের জন্য উজাড় করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা উৎসাহ প্রদান, অন্তরে আকর্ষণ সৃষ্টি ও ইসলামের উপর দৃঢ়পদ ও অনঢ় রাখার জন্য যাকাতের একটা অংশ অমুসলিমদের জন্য বরাদ্ধ করেছেন। ফলে তাদের অনেকেই ইসলামের মূল্য অনুভব করতে পেরে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে।

উত্তম চরিত্রগুলো তুলে ধরা, তার প্রতি তাগিদ ও উৎসাহ প্রদান আমাদের যেমন দায়িত্ব, মন্দ স্বভাব ও বিচ্যুতিগুলো ভুলে যাওয়া, তা এড়িয়ে চলা ও ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা তেমন দায়িত্ব। অতএব আপনার নিকট যদি তা পরিবর্তন করে সুন্দরে রূপান্তর করার সামর্থ থাকে, তবে করে ফেলুন। যদি তা পরিবর্তন করার সামর্থ না থাকে, তবে ভুলে যেতে চেষ্টা করুন। কারণ, মন্দ বিষয় প্রকাশ করা ও জনসম্মুখে তুলে ধরা তার প্রতি তাগিদ প্রদানেরই নামান্তর। আপনি যদি কোন লোককে উপদেশ দিতে চান, তাহলে আপনাকে ইতিবাচক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে হবে, এবং এত বেশী পরিমাণ আলোচনা করতে হবে যে, নৈতিবাচক বিষয়ের উপর যেন আপনিই বিরুদ্ধাচারী হয়ে যান। হ্যাঁ, তাকে কোনরূপ আঘাত না করে বিনম্রভাবে নৈতিবাচক বিষয়গুলোর প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। যাতে তার ও আপনার মধ্যে সম্পর্কের

পথরুদ্ধ হয়ে না যায়। আপাকে আরো মনে রাখতে হবে আদম সন্তান ভুলে-ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। অসংখ মানুষ ভুল করার পরও অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর নিকট তওবা করে সঠিক পথে ফিরে এসেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন:

خير الخطائين التوابون

"উত্তম ভুলকারীগণ তারাই যারা তওবাকারী।"

দাওয়াতের ক্ষেত্রে সামাজিক চিকিৎসা পদ্ধতি আছে কি?

মনোবিজ্ঞান কখনো সামাজিক চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে নির্দিষ্ট সংখ্যক জনসাধারণকে সমবেত করে, মনোবিজ্ঞানী যখন উপলব্ধি করতে পারে তাদের সকলের পরিবেশ ও অবস্থার মধ্যে সামাঞ্জস্য আছে। এ জাতীয় চিকিৎসার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানীগন আদর্শ সংখ্যাটাকে ৬-৮ ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে। তবে সংখ্যা এর চেয়ে বৃদ্ধি পেলে তাদের মধ্যে শৃংখলা বজায় রাখা দুরহ ব্যাপার হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে উক্ত সংখ্যা এর কম হলেও কার্যকারিতা হ্রাস পাবে। এই দলটির এক সঙ্গে বসবাসের মধ্য দিয়েই চিকিৎসা হয়ে যাবে। দাওয়াতের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিকোণ ও এই সহাবস্থান একটি মহতী উদ্যোগ এবং আচরণের সংস্কারে প্রভাব বিস্তারকারী। কারণ সেই দলের প্রত্যেকটি সদস্য মনে করে সে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মুখোমুখি। যেহেতু তা অসংখ্য মানুষের মধ্য হতে বাছাই করে তাকে মনোনীত করা হয়েছে। সে কারণে প্রত্যেকেই চেষ্টা করবে দলের মধ্যে ব্যতিক্রম ও অনন্য হতে। অতএব এই দৃষ্টিকোণ ও তাদের জন্য অনুপ্রেরনা।

সর্বশেষে একটি বিষয় থেকে যায়, যা কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময় আচার-আচরণের ধরণ-প্রকৃতি ও নতুনত্ব বিশেষ পর্যবেক্ষণ ও গুরুত্বের দাবীদার। ব্যাপক অনুভুতি সৃষ্টি অথবা কোন আচরণকে উৎকৃষ্টতার দিকে রূপান্তরের লক্ষ্যে জীবনের সকল ঘটনার সঙ্গে সাধারণভাবে সংযোগ স্থাপন করা কর্তব্য। যখনই কোন ঘটনা সংঘটিত হয়, তখন তার সাথে যুক্ত হয় ভুল-ত্রুটির অনুভুতি। অতঃপর সেটা তার স্মৃতিতে জাগ্রত থাকে। এভাবে অন্য ঘটনা সকল ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হয়। আর সবগুলো একত্রিত হয়ে তার অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয়ে আচরণ পরিবর্তনের কারণ হয়।

ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট আচার-আচারণ, ধরণ-প্রকৃতি যে কতখানি প্রভাবিত করে এর একটি উদাহরণ হিসেবে জিবরীল এর ঈমান ও ইসলামের ব্যাখ্যা সম্বলিত হাদীসের ঘটনা পেশ করা যেতে পারে। যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের নিকট বর্ণনা করেছেন। জিবরীলের মানুষের আকৃতি ধারন করা, প্রশ্নকারীর চরিত্রে অভিনয় করা, এসবের উদ্দেশ্য হলো বিষয়বস্তু অন্তরে গেঁথে দেয়া অথবা তাদেরকে একটি তথ্য প্রদান। অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য এ রকম বলা সহজ ছিল যে, ইসলামের রোকন হচ্ছে- এই, এই..., কিয়ামতের নিদর্শন হচ্ছে-এই , এই...; কিন্তু এই বয়ানটা একটি প্রানবন্ত, হৃদয়গ্রাহী ও প্রত্যক্ষরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে যা ভুলে যাওয়া সহজ হয় না। যেমন বর্ণনাকারী বললেন, ‘আমাদের নিকট ধপধপে সাদা পোশাক পরিহিত, ঘনকাল কেশধারী এক ব্যক্তি আগমন করল, যাকে আমাদের মধ্যে কেউ চেনে না। আবার তার শরীরে ভ্রমনের কোন চিহ্ন দেখা যায় না ...।’ এটা একটি

অনভিপ্রেত বিষয় ও অবিস্মরনীয় ঘটনা যা তাদের স্মৃতিতে চির ভাস্বর হয়ে থাকে ।

আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন তা দ্বারা আপনাদেরকে এবং আমাকে উপকৃত করুন ।

أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.